৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

- ইউ· এস· ওপেন টেনিস জিতবে কারা
- জিনা যেন রূপকথার চরিত্র

মার্টিন ক্রোর পোস্টার

- মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সম্পূর্ণ উপন্যাস 'ইস্কুলের ছুটি'
- চিত্রা দেবের ইতিহাসের গল্প
- সহজে ফরট্রান
- কেরিয়ার গাইড

কুমেরুর অভ্যন্তরে

কী আছে কুমেরু মহাদেশে ?
বিজ্ঞানীদের কেন এত আগ্রহ ?
কীভাবে বেঁচে আছে পেঙ্গুইন, সিল ও অ্যালবাট্রস ?
বরফে তলিয়ে গেল কেন কুমেরুতে ভারতের প্রথম গবেষণা কেন্দ্র 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' ?
সুদীপ্তা সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার ।

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

Amul
MILK CHOCOLATE
বদমাইস মোটকার জন্যে
Amul
CRISP
MILK CHOCOLATE
ঘ্যানঘেনে পিংকির জন্যে
Amul
FRUIT & NUT
MILK CHOCOLATE
শয়তান ছোটকার জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
FLAVOURED
আমার সবচেয়ে আদরের প্রীতির জন্যে
Amul
Badambar
চামচা চিন্টুর জন্যে
Amul
CRUNCH
MILK CHOCOLATE
আমার টীচারের জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
Amul
CRISP
Amul
MILK CHOCOLATE
এসবই আমারই আমার জন্যে
বিক্রী ব্যবস্থায় :
গুজরাট কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিঃ
আনন্দ-৩৮৮ ০০১
আমুল চকোলেট — তোমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে সেরা উপহার !
RADEUS/AMC/036/90 BEN

সূচীপত্র

১৯ ভাদ্র ১৩৯৭ □ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■
ইস্কুলের ছুটি মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৫৬
■ গল্প ■
মালাম্মার প্রতিজ্ঞা চিত্রা দেব ৩৩
ফুলকুঁড়ি স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায় ৩৭
■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■
কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ৫
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
■ প্রচ্ছদকাহিনী ■
কুমেরুর অভ্যন্তরে স্বপনকুমার দাস ১২
সুদীপ্তা সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার ১৬
■ কমিক্স ■
টারজান ৩১, গাবলু ৩২, রোভার্সের রয় ৪৯, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩
■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■
সহজে ফরট্রান অসীমরতন ঘোষ ২৬
■ কবিতা ■
জানলা খোলা শ্যামলকান্তি দাশ ৩৮
■ কেরিয়ার গাইড ■
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং অমর দাশ ৭৮
■ খেলাধুলো ■
ইউ· এস· ওপেন টেনিস···সুজিত রায় ৪২
যেন রূপকথার চরিত্র জিনা সুব্রত সরকার ৪৫
সর্বকালের সেরা বিশ্ব একাদশ ফ্রাঙ্ক ম্যাকঘি ৪৬
রেকর্ড ভেঙে চলেছেন গ্রেম হিক প্রবীর বসু ৪৮
ছক্কার ছড়াছড়ি তানাজি সেনগুপ্ত ৫২
খেলার খবর ৫৪
রঙিন পোস্টার : মার্টিন ক্রো ৪১
■ নিয়মিত·বিভাগ ■
চিঠিচাপাটি ৪, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কুইজ ২৮, আকাশে ওড়ার কথা ৪০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫১, আঁকিবুকি ৬৮, হাসিখুশি ৬৮, শব্দসন্ধান ৭০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ ■
সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

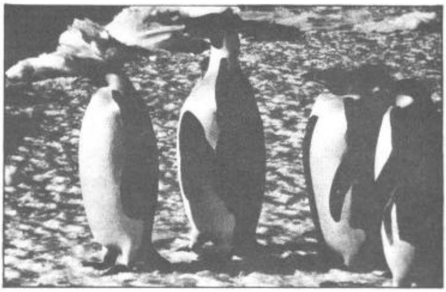

১২

অভিযাত্রীদের কাছে কুমেরু মহাদেশের আকর্ষণ দুর্নিবার। শুধু অভিযাত্রীরা নন, বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে এসেছেন। জীববিদ, ভূতাত্ত্বিক, পরিবেশবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ—সকলেই এখন কুমেরু মহাদেশে গবেষণায় উন্মুখ। এর কারণ একটাই। কুমেরু মহাদেশে এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়ে গেছে সৃষ্টিরহস্যের অনেক অজানা তথ্য। মিশরীয় ভৌগোলিক টলেমি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে অজ্ঞাত এই মহাদেশটির নাম রেখেছিলেন 'টেরা অস্ট্রালিস ইনকগনিটা'। অর্থাৎ দক্ষিণের অজ্ঞাত মহাদেশ। তারও আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ – ৩২২) এর নাম রেখেছিলেন 'অ্যান্টার্কটিকা'।

৪২

ইউ· এস· ওপেনে এবার পুরুষদের বাছাই তালিকার শীর্ষে আছেন স্টেফান এডবার্গ। মেয়েদের বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানটি পেয়েছেন স্টেফি গ্রাফ। শেষ পর্যন্ত কে জিতবেন ? বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানটি না পেলেও লেন্ডল কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। উইম্বলডনের তুলনায় ইউ· এস· ওপেনে তাঁর রেকর্ড ভাল। পর পর আটবার তিনি উইম্বলডন ফাইনালে উঠেছেন।

৩৩

ছত্রপতি শিবাজি এবং তাঁর মাওয়ালি সৈন্যদের কথা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই শিবাজিকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করেছিলেন বেলাভাদি নামে ছোট্ট এক রাজ্যের রানি মালাম্মা। ইতিহাসের গল্প। লিখেছেন চিত্রা দেব।

■ আগামী সংখ্যায় ■

প্রচ্ছদকাহিনী
এবারের এশিয়াড

বেজিং-এ আর কয়েকদিন পরেই বসছে একাদশ এশিয়াডের আসর। কোন দেশ বেশি সোনা পাবে, ব্যক্তিগতভাবে কারা নজর কাড়বেন, এ নিয়ে থাকছে দুর্দান্ত সব লেখা। এক কথায় এই সংখ্যা 'এশিয়াড গাইড'।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
ইস্কুলের ছুটি

চিঠিচাপাটি

বিমান-যুদ্ধ প্রসঙ্গে

আমার খুব ভাল লেগেছে ৮ অগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিমান-যুদ্ধ' প্রচ্ছদকাহিনীটি। ওই লেখাটিতে 'মিগ-২৭' নামে যে বিমানটির ছবি ছাপা হয়েছে, তা ভুল। ওটি

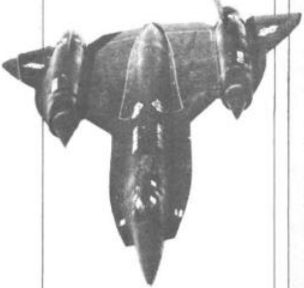

'লকহিড এস আর-৭১' নামের একটি মার্কিন বিমানের ছবি।

অমৃতা গাঙ্গুলি
কলকাতা-৪

সম্পাদকীয় উত্তর : এই বিমানের ছবিটি 'লকহিড এস আর-৭১' বিমানেরও ছবি নয়। এটি আসলে 'লকহিড ওয়াই এফ-১২' বিমানের ছবি।

কেরিয়ার গাইড

কেরিয়ার গাইড বিভাগের সমস্ত লেখাই ভাল লাগে, কেননা, এই লেখাগুলি পড়ে ভবিষ্যৎ-জীবনের পরামর্শ পাওয়া যায়। ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় বসতে হলে কী যোগ্যতার দরকার, পরীক্ষার বিষয়বস্তু কী (আবশ্যিক তিনটি পত্রে) এবং কোন সময় পরীক্ষা হয়, জানালে উপকৃত হব।

শিবানী চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৫

সম্পাদকীয় উত্তর : ৪ এপ্রিল ১৯৯০ সংখ্যায় ক্লার্কশিপ পরীক্ষা বিষয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। তবু জানাই, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা থাকলেই এই পরীক্ষায় বসা যায়। তবে প্রার্থীর বয়স যেন ১৮ বছরের কম এবং ৩০ বছরের বেশি না হয়। সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার বেশ কয়েক মাস আগেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত চাওয়া হয়। পরীক্ষার তিনটি আবশ্যিক পত্র হল—ইংরেজি, বাংলা, জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিক। তৃতীয় পত্রের পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন থাকে। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক (অ্যারিথমেটিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্রের মান হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো।

প্রথম পত্র অর্থাৎ ইংরেজি বিষয়ের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে লেটার রাইটিং অর্থাৎ ড্রাফটিং অব এ রিপোর্ট, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ, সামারি বা প্রেসি রাইটিং, কারেকশন অব সেনটেন্স, ইউজ অব কমন ফ্রেজ, সিনোনিমস এবং অ্যানটোনিমস ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলা বিষয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত আছে—পত্র লেখা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ, কনডেন্সিং অব এ প্রোজ প্যাসেজ, গ্রামার ইত্যাদি। তৃতীয় পত্রে দুটি বিভাগ। গ্রুপ 'এ'তে আছে—জেনারেল স্টাডিজ। জেনারেল স্টাডিজের ক্ষেত্রে সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান ঘটনা, ভারতের বিভিন্ন ঘটনা এবং সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। ভারতের ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়েও প্রাথমিক জ্ঞানের প্রশ্ন থাকে। গ্রুপ 'বি'তে থাকে অ্যারিথমেটিক। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসই এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। যেসব প্রার্থীর মাতৃভাষা বাংলা নয় তাঁরা দ্বিতীয় পত্রে বাংলার পরিবর্তে হিন্দি বা নেপালি বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে পারেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন আগে তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তৃতীয় পত্রের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কৃতকার্য হলে দ্বিতীয় এবং প্রথম পত্রের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাওয়া যায়।

সেরা গোয়েন্দাদের নিয়ে

'কে সেরা গোয়েন্দা' প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়ে খুব ভাল লাগল। অন্ধ গোয়েন্দা ক্যারাডস ও ফাদার ব্রাউন-এর সম্বন্ধে পড়ে অনেক কথা জানতে পারলাম। বিদেশী গোয়েন্দাদের মধ্যে শুধু শার্লক হোমসের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম। এইসঙ্গে আমার একটি প্রস্তাব—বিদেশী গোয়েন্দা-উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ যদি আপনারা প্রকাশ করেন, খুব ভাল হয় তা হলে।

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, ভাইজাগ

'কে সেরা গোয়েন্দা' প্রচ্ছদকাহিনীর জন্য আনন্দিত হয়েছি। শাক্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীশ দেবের লেখা থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম। কিশোর-গোয়েন্দা সম্পর্কে যদি কিছু লেখা হত ভাল লাগত খুব।

আদিত্য মিত্র, কালীঘাট, কলকাতা

যাদের ছাড়া ছুটির দুপুর কাটতেই চায় না, তাদের সম্বন্ধে প্রচ্ছদকাহিনী ২৭ জুন সংখ্যায় পড়লাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি শাক্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কে সেরা গোয়েন্দা' এই আলোচনার জন্য। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই আলোচনা। তবে বাঙালি গোয়েন্দাদের নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা থাকলে ভাল হত।
রহস্যকাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে অনীশ দেবের আলোচনা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।
'ফেলুদা শব্দচক্র' অত্যন্ত আকর্ষক, তবে উত্তরটা পরের সংখ্যায় থাকলেই ভাল হত।

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার

২৭ জুন সংখ্যায় শাক্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে সেরা গোয়েন্দা' রচনাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। তথ্যবহুল এই রচনায় আমরা হোমস ক্রিস্টি কিংবা অ্যালেন পো ছাড়াও আরও অনেক খ্যাতনামা গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেজন্য লেখককে অজস্র ধন্যবাদ। তবে ক্রাইম জগতের বিখ্যাত চরিত্র বন্ড বা লেখক চেজ এর নাম দেখতে পেলাম না। পাশাপাশি এ দেশের গোয়েন্দাদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের বিমল-কুমার জুটি, কিংবা পেশায় গোয়েন্দা না

হলেও ভূতাত্ত্বিক এবং প্রতিবন্ধী রাজা রায়চৌধুরী ওরফে কাকাবাবু এবং সন্তু কিন্তু এখন বেশ জনপ্রিয়। এ ছাড়া সমরেশ মজুমদারের তরুণ সত্যসন্ধানী অর্জুন লাইটার রহস্য সমাধান করে বেশ নামযশ করেছেন।

সুদীপ্ত দাস, দুর্গামন্দির, আসানসোল

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

নেতাজির স্ট্যাচুটাকে বাঁ দিকে রেখে করলা সেতুর ওপর উঠে বাইকটাকে থামাল অর্জুন। একপাশে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে রেলিঙে ভর করে নদীর দিকে তাকাল। এখন নদীর জল কচুরিপানায় ছাওয়া। আর একটু দূরে যেখানে করলা গিয়ে তিস্তায় পড়েছে, সেখানে জল স্থির হয়ে গেছে চড়া ওঠায়। এই জায়গাটা বড় ছিমছাম, নির্জন। অর্জুন একটা সিগারেট ধরাল। গত বছর ভোট দিয়েছে সে। এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা এখনও কিছু ব্যাপার মেনে চলে। অর্ধ-পরিচিত বয়স্ক মানুষকে দেখে অনেকেই সিগারেট লুকোয়। পরিচিতি বেড়ে যাওয়ায় অর্জুনের পক্ষে অচেনা মানুষকে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে এইরকম নির্জন জায়গা বেছে নিতে হয় সেই কারণে।

পুরো ব্যাপারটাকেই তার অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে। অথচ অমল সোম বললেন, "ইন্টারেস্টিং।"

কয়েকশো বছর আগে একটি অত্যাচারী সেনাপতি কোথায় কী লুকিয়ে রেখেছিল তাই খোঁজার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে এসেছেন হরিপদ সেন। এ যেন হিমালয়ের বরফের মধ্যে থেকে একটা সুচ খুঁজে নিয়ে আসার মতো ব্যাপার। লোকটাকে স্বচ্ছন্দে পাগল বলা যেত, যদি না ওই চিঠিটা তিনি দেখাতেন। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, ওই চিঠি হরিপদবাবু নিজেই লিখে নিয়ে আসতে পারেন ঘটনার গুরুত্ব বাড়াতে। অমলদা এটা ভাবলেন না কেন? এমন চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে লেখানোর বোকামি কেউ করে না, নিশ্চয়ই হরিপদ সেনও নির্বোধ নন। ভদ্রলোকের হাতের লেখার নমুনা যদি পাওয়া যেত! কিন্তু মুশকিল হল কোনও সমস্যারই এত সহজে সমাধান হয় না।

জীবিত মানুষকে খুঁজে পেতেই হিমশিম খেতে হয়, আর এ তো মৃত মানুষ। পনেরশো আশি খ্রিস্টাব্দে যে মানুষটি মারা গিয়েছে সে কোথায় কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাওয়া। অর্জুন হেসে ফেলল। এই তো, কুড়ি বছরেই জলপাইগুড়ির চেহারা কত বদলে গেল। আটষট্টির বন্যার আগে শহরটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল। অমলদা বলেন, তিস্তায় বাঁধ হওয়ার আগে চরে অদ্ভুত চেহারার ট্যাক্সি চলত। এসব এখন কি তারা ভাবতে পারে? অত কথা কি, জলপাইগুড়ির খেলাধুলোর জগতে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি সেই রায়সাহেব তো মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হল। এখন যদি তাঁকে বলা হয় রায়সাহেব, কখন কোথায় গিয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আবিষ্কার করো, তা হলে কি সে সক্ষম হবে? অথচ অমলদা বলে দিলেন কাল সকালের মধ্যে কালাপাহাড় লোকটা, মানে ইতিহাসের সেই সেনাপতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে এসো। কালাপাহাড় সম্পর্কে চালু ইতিহাস বইয়ে নাকি দু-চার লাইনের বেশি জানতে পারা যায় না। এখন লাইব্রেরি খোলার সময় নয়। তা হলে বাবুপাড়া পাঠাগারে গিয়ে দেখা যেত কালাপাহাড়ের ওপর কোনও বই পাওয়া যায় কি না! সিগারেট শেষ হল তবু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না অমল সোম এরকম কেস নিলেন কেন! আগামীকাল সকালে যদিও দেখা করতে বলেছেন, আর সেটাই তো নেওয়ার লক্ষণ।

এই সময় ওর গৌরহরিবাবুর কথা মনে পড়ল। স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। দু' বছর আগে অবসর নিয়ে সেনপাড়ায় আছেন। অনেককাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। অবসর নেওয়ার কথাটা সে শুনেছিল। খুব রাগী মানুষ, পড়া না করে এলে খেপে যেতেন। অর্জুন বাইক ঘোরাল।

সেনপাড়ায় গৌরহরিবাবুর বাড়িতে সে ছাত্রাবস্থায় একবার এসেছিল। আজ খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। টিনের ছাদ, গাছপালা আছে। রাস্তার দিকটা টিনের দেওয়াল তুলে একটু আব্রু রাখার চেষ্টা। গরিব মাস্টারমশাইয়ের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। অর্জুন বাইরের দরজায় তিনবার শব্দ করার পর একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, "কে?"

"সার আছেন? আমি অর্জুন।"

তিরিশ সেকেন্ড বাদে দরজাটা খুললেন এক প্রৌঢ়া, "ওঁর শরীর ভাল নেই।"

"ও, ঠিক আছে তা হলে।" অর্জুন ফেরার জন্য ঘুরছিল, এই সময় ভেতর থেকে গৌরহরিবাবুর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁগো, কে এসেছে, সার বলল যেন?"

"তোমার নাম অর্জুন বললে?" প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা নাড়ল। তিনি তখন গলা তুলে সেটা জানিয়ে দিতেই গৌরহরিবাবু ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

অর্জুন উঠোনে পা দিল। নানারকম ছোট গাছে উঠোন সাজানো। টাঙানো দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে। গলার স্বর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকের বারান্দায় পা দিল সে। দরজা দিয়েভেতরের ঘরটিতে যে আলো ঢুকছে তাতেই গৌরহরিবাবুকে দেখা গেল। একটা খাটে শুয়ে আছেন তিনি, মুখে হাত চাপা দিয়ে। অর্জুন বলল, "সার, আপনি অসুস্থ?"

হাত সরালেন গৌরহরিবাবু, "অর্জুন মানে, আমার ছাত্র যে গোয়েন্দা হয়েছে?"

অর্জুন হাসল, "আমি বলি সত্যসন্ধানী।"

"ভাল শব্দ। গর্ব হয়। বুঝলে হে। তোমরা যারা নাম করেছ তাদের জন্য গর্ব হয়। অসুস্থ, মানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। চোখে কম দেখি। এখন আলো পড়লে কষ্ট হয়। তা কী ব্যাপার বাবা ? আমার কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন ?" চোখ বন্ধ করেই প্রশ্ন করলেন গৌরহরিবাবু। অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। ঠিক কীভাবে প্রশ্নটা করবে বুঝতে পারছিল না। তা ছাড়া শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে সে এসেছে এটা জানাতেও খারাপ লাগছিল।

অর্জুন বলল, "আপনি অসুস্থ, আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

"কথা বলতে তো কোনও অসুবিধে নেই। চোখ বন্ধ রাখতে হবে এই যা।"

"আমি একটু সমস্যায় পড়েছি। ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে একটি মানুষের কথা পড়েছিলাম। আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"কালাপাহাড় ? দাউদ খাঁয়ের সেনাপতি। পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

"হ্যাঁ। ওঁর সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কোথায় পাব ?"

"বিস্তারিত জানতে হলে অনেক বই পড়তে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' নামে একটা বই বেরিয়েছিল, এখানে তো পাবে না। এই উত্তর বাংলায় কালাপাহাড়ের আনাগোনা ছিল। মনে করে তোমাকে আমি একটা বই-এর লিস্ট তৈরি করে দেব যা পড়লে অনেকটাই জেনে যাবে। এই কালাপাহাড়ের আসল নাম কী জানো ?"

"উনি আগে হিন্দু ছিলেন।"

"হ্যাঁ। তখন হয় রাজকৃষ্ণ, রাজচন্দ্র, নয় রাজনারায়ণ, এই তিনটির একটি হল ওঁর আসল নাম। লোকে জানত রাজু বলে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দাবি করেছিলেন যে, উনি আফগান। এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। অসমে গেলে দেখবে লোকে ওঁকে পোড়াসুঠার, পোড়াকুঠার অথবা কালাসুঠান বলে চেনে। আমাদের কী অবস্থা, চারশো বছর আগের ঘটনাতে কত ধোঁয়াশা ছড়িয়ে আছে।"

অর্জুন আজকাল পকেটে একটা ছোট্ট ডায়েরি রাখে। তাতেই গৌরহরিবাবুর বলা নামগুলো নোট করে নিচ্ছিল। গৌরহরিবাবু একটু ভেবে নিলেন, "রাজু ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র চালাতে সে পারদর্শী হয়ে উঠল। ছেলের এই মতিগতি তার বাবার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তখন বাংলার নবাব সুলেমান কিরানি। কিন্তু ছোট-ছোট নবাবের সংখ্যাও বেশ। এরা নামেই নবাব, আসলে জায়গিরদার ধরনের। সুলেমান কিরানিকে কর দিত। এই রকম এক জায়গিরদারের মেয়ের প্রেমে পড়ল রাজু। মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণতনয়ের সম্পর্ক হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চারশো বছর আগে হতে পারত তা অনুমান করতে পারো নিশ্চয়ই।" হঠাৎ থেমে গেলেন গৌরহরিবাবু। কিছু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙালির ইতিহাসটা তুমি জানো তো ?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। সে যেটুকু জানে তা গত দুশো বছরের। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ এ-দেশের দখল নেওয়ার পরে যা ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো। স্বীকার করল সে। গৌরহরিবাবু হাসলেন, "না, এতে সঙ্কোচ করার কিছু নেই। তোমরা জানো না সেটা আমাদের লজ্জা। আমরা ইতিহাস বইয়ে রাজা নবাবের গল্প লিখি। তাই পাঠ্য হয়। কিন্তু নিজেদের কথা আলাদা করে তোমাদের পড়াইনি। আমরা আবেগে চলি। ইতিহাস খুবই বাস্তব।"

অর্জুন চুপচাপ রইল। কালাপাহাড়ের কথা জানতে এসে কেন বাঙালির ইতিহাস শুনতে হবে এই প্রশ্ন করা যায় না। তবে বাঙালি হিসেবে নিজেদের ইতিহাসটা নিশ্চয়ই জানা দরকার।

গৌরহরিবাবু বললেন, "আগে যাদের আদি অস্ট্রেলীয় বলা হত এখন তাদের ভেড্ডিড বলা হয়। এরাই ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। লম্বা মাথা, চওড়া নাক, কালো রং আর মধ্যম আকার। এখনও বাঙালিদের মধ্যে ভেড্ডিডদের কিছু শব্দ চালু আছে, গ্রামের হাটে গেলে শুনবে এক কুড়ি পান, দু' কুড়ি লেবু। হাত-পায়ের আঙুল মিলিয়ে এই কুড়ি শব্দটি ভেড্ডিডদের দান। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষেরা এককালে এ-দেশের নদনদী পাহাড় আর জায়গার যে নামকরণ নিজেরা করেছিল এখনও আমরা তাই বলি। যেমন কোল দব-দাক বা দাম-দাক থেকে কপোতাক্ষ বা দামোদর নদ। দা বা দাক মানে জল।

"বাংলা নামটা এল কোত্থেকে ? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি বইয়ে বলেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে। আল মানে একটা বাঁধ। জলের দেশে বাঁধ দরকার হয়। তাই বাংলা। বাংলাদেশে একসময় অনেক মানুষের ভিড়। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। বঙ্গের নাম মহাভারতে আর বৃহৎসংহিতায় পাওয়া যায়। আমি এসব বেশি বললে তুমি হয়তো বিরক্ত হবে। ওই চারটি ভাষার মানুষ চারটি জায়গা জুড়ে ছিল যা পরে সমগ্র বাঙালি জাতির মাতৃভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে। আগে ছিল সব টুকরো-টুকরো। এ

ওর ভাষা বুঝত না। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেহারা দেন। শশাঙ্কের পর তিনটে জনপদ হল। পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গ। পাল আর সেনরাজারা সমস্ত বাংলাদেশকে গৌড় নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয়নি। তিনটে কমে দুটোতে এসে ঠেকেছিল। গৌড় এবং বঙ্গ।

"শশাঙ্কের পর এ-দেশে মাৎস্যন্যায় চলেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা ভাষার মানুষ এখানে এল। এমনকী কাশ্মিরের রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য পর্যন্ত গৌড় আক্রমণ করে বিজয়ী হন। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। বাংলার অন্য রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক সম্ভবত হর্ষবর্ধনের জন্যই বৌদ্ধধর্মবিরোধী। এর পরে গোপালদেব এসে মাৎস্যন্যায় দূর করেন। শুরু হল পাল বংশ। আজকের বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন হয়েছে এই যুগেই। অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। সেই অর্থে বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের বেশি নয়।"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ইতিহাস মাত্র হাজার বছরের?"

"হ্যাঁ। তাও ধাপে-ধাপে এগিয়েছে। লক্ষ্মণসেনরা ছিলেন কর্নাটকের মানুষ। ওঁর পূর্বপুরুষ পালরাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকপুরুষ থাকার ফলে এখানকার মানুষ হয়ে যান শেষপর্যন্ত। তা আজকের বাঙালির অনেকের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। তারপর মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণসেনকে ঢাকার কাছে লক্ষ্মণাবতীতে পাঠিয়ে এদেশ দখল করে নিলেন। পালেদের সময় এদেশে বৌদ্ধরা এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব খুব সীমায়িত ছিল। পাঠানরা ক্ষমতা পাওয়ার পর এদেশে যারা কিছুটা নির্যাতিত তারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মুসলমান হলেন। কেউ-কেউ চাপে পড়ে বা অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়ার জন্যও ধর্মবদল করেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এইসব ধর্মান্তরিত মানুষকে হিন্দু বাঙালি সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু নবাবের ভয়ে সরাসরি কোনও ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের দুটি ধারা পৃথকভাবে বয়ে চলে। দিনে-দিনে এ-দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এইরকম পরিস্থিতিতে রাজু বা রাজকৃষ্ণ ধর্মান্তরিত হন।

"সে-সময় হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা বৌদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্কীর্ণতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দুধর্মে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। পাঠানদের এদেশের মানুষ সাধারণত শত্রু বলেই মনে করত। তাদের ধর্ম যেসব স্বদেশী গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা করার উদারতা এদের ছিল না।

"ধর্মান্তরিত রাজু তাই বিতাড়িত হল। তার পরিবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সে বাধ্য হল। পরবর্তীকালে রাজুকে আবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেনি। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নির্মমভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বভাবতই হিন্দুবিদ্বেষী হতে তার বেশি দেরি হয়নি। রাজু ক্রমশ নবাবের সৈন্যদলে বিশিষ্ট হয়ে উঠল। নবাবি সৈন্য যখন কোনও অভিযান করত তখন তার লক্ষ্য ছিল সেই অঞ্চলের মন্দির ভাঙা, বিগ্রহ চূর্ণ করা আর হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানো। আর এই কারণেই লোকে তার নামকরণ করল কালাপাহাড়।"

কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গে চলে আসায় অর্জুন খুশি হল। এতক্ষণ সে একটু বিষণ্ণ ছিল। ইংরেজ বা ফরাসিরা নাকি হাজার-হাজার বছর ধরে নিজেদের সভ্য করেছে, রোমানদের সংস্কৃতিও সেইরকম। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব কোনও সংস্কৃতি হাজার বছরের বেশি নয়, এটা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগছিল।

গৌরহরিবাবু একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "কালাপাহাড় সুলেমান কিরানি এবং পরে ওঁর ছেলে দাউদের সেনাপতি হয়েছিলেন। ওদিকে অসম আর এদিকে কাশী এবং ওড়িশার প্রায় কোনও মন্দির কালাপাহাড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। বোঝা যাচ্ছে এই অঞ্চল জুড়ে ওর গতিবিধি ছিল। গল্প আছে, মন্দির ধ্বংস করার আগে কালাপাহাড় সৈন্যদের দূর থেকেই কাড়ানাকাড়া বাজাতে বলত।

"কালাপাহাড় ওড়িশা-অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজা মুকুন্দদেব পুরীতে। মুকুন্দদেবের পরাজয় হয়। ওঁর ছেলে গৌড়িয়া গোবিন্দকে পদানত করে কালাপাহাড় পুরীর মন্দির ধ্বংস করতে যায়। পাণ্ডারা এই খবর পেয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে গড় পারিকুদে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কালাপাহাড়ের হাত থেকে তবু সেই মূর্তি রক্ষা পায়নি। জগন্নাথদেবের মূর্তি পুড়িয়ে সে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। কালাপাহাড়ের অনেক আগে তিনশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে রক্তবাহু নামে একজন পুরী আক্রমণ করেছিল কিন্তু তখন পাণ্ডারা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

"আকবরনামায় আছে দাউদের বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য মুঘল সম্রাট সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠায় তাকে বন্দী করতে। কালাপাহাড় দাউদের সেনাপতি হিসেবে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। একসময় সে কাকসাল

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।

প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।

কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়।

23

সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

GX/62/234 BEN

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

নামে একটি জায়গাও অধিকার করে। কিন্তু পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড় মারা যায়।

"একজন বাঙালি হিসেবে কালাপাহাড় আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে লোকটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্রাহ্মণরা ওকে হিন্দুবিদ্বেষী করেছিল। সেই মানুষ আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি রহস্য আমাকে খুব ভাবায়। আমি অনেককে চিঠি লিখেছিলাম। কেউ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তুমি শুনতে চাও?"

"বলুন।" অর্জুন এখন এই কাহিনীরসে প্রায় ডুবে গিয়েছে।

"কালাপাহাড় ওড়িশা অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তার ঠিক বত্রিশ বছর, মাত্র বত্রিশ বছর আগে এক বাঙালি মহাপুরুষের পুরীতে মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে গিয়েছিলেন পনেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দে। তখন পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভক্ত হন। পরে যখন চৈতন্য পুরীতে পাকাপাকি বাস করছেন তখন রাজা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও কাজ করতেন না। পনেরোশো কুড়ির পর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস আর তিনি মহাপুরুষের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। রাজার এক ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধর পাণ্ডাদেরখেপিয়ে তুললেন।তাদের বোঝানো হল রাজা জগন্নাথের চেয়ে চৈতন্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। যে চৈতন্য জাত বিচার করল না, রাজা যদি তাঁর শিষ্য হন তা হলে জগন্নাথের মন্দির তো অপবিত্র হয়ে যাবে। পুরীতে তখন কিছু বৌদ্ধসঙ্ঘ ছিল। রাজার ভাই তাঁদেরও খেপিয়ে তুললেন চৈতন্যের বিরুদ্ধে। রাজা না-জগন্নাথ না-বৌদ্ধসঙ্ঘ কারও দিকে নজর দিচ্ছেন না, শুধু চৈতন্য নামে নবদ্বীপ থেকে আসা লোকটির মায়ায় ভুলে আছেন, এই তথ্য অনেককেই ক্রুদ্ধ করল। গোবিন্দ বিদ্যাধর গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

"চৈতন্যদেব জগন্নাথে লীন হননি, সমুদ্রে ভেসে যাননি। তা হলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যেত। শুধু তিনি নন, তাঁর পার্ষদদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পনেরোশো তেত্রিশের ঊনত্রিশে জুন দুপুর থেকে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। চৈতন্যদেবকে সপার্ষদ সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁরা উধাও। রাজা এই অন্তর্ধানের তদন্ত করতে চেয়েও সফল না হয়ে কটকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যুবরাজকে পাঠিয়েছিলেন। যুবরাজ মাস-চারেকের মধ্যেই নিহত হন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক এবং পাণ্ডাদের শত্রু হিসেবে প্রচার করে যাঁর লাভ হত সেই রাজার ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধরের সিংহাসন দখল করার বাসনা পূর্ণ হয়নি।

"নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এই খবর পৌঁছেছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ হয়ে লীন হয়ে গেছেন, এই বিশ্বাস অনেকেই করেননি। পুরী অভিযানের আগে কালাপাহাড় গিয়েছিল নবদ্বীপে। অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেখানকার মন্দিরের ওপর তেমনভাবে ক্রুদ্ধ হতে পারেনি। সেই প্রথম সে জানতে পারে চৈতন্য নামের একটি মানুষ হিন্দু-মুসলমানকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছেন। কোনও ভেদাভেদ রাখেননি। এই তথ্য কি কালাপাহাড়ের হৃদয়ের ক্ষতকে শান্ত করেছিল? তার নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীত ছবি দেখে সে কি চৈতন্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল? তার কানে কি চৈতন্যের অন্তর্ধানের খবর পৌঁছেছিল? পাণ্ডাদের রাজনীতির শিকার

হয়েছিলেন চৈতন্য, এইরকম ধারণা করেই কি সে প্রতিশোধ নিতে পুরী অভিযান করেছিল? মাত্র বত্রিশ বছর পরেই আর-এক বাঙালির এই অভিযান কি শুধুই রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা? কালাপাহাড় অন্য জায়গার মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু জগন্নাথের মন্দির পাণ্ডাদের দখলে বলে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছায় বিগ্রহ পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল? কেউ উত্তর দিতে পারেননি। যদি আমার সন্দেহ সত্যি হয় তা হলে কালাপাহাড়ের চরিত্রের আর-একটি দিকে আলো পড়বে। আমরা নতুনভাবে বিস্মিত হব।"

এই সময় সেই প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়ালেন, "তুমি অনেকক্ষণ কথা বলেছ। আর নয়।"

গৌরহরিবাবু হাসলেন, "প্রিয় বিষয়, পুরনো ছাত্র!"

"তা হোক। দরকার থাকলে না হয় পরে আসবে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "সার, আমি চলি। দরকার হলে পরে আবার আসব।"

গৌরহরিবাবু শুয়ে-শুয়েই হাত নাড়লেন। তাঁর চোখ বন্ধ। প্রায় দৃষ্টিহীন এই ইতিহাস-প্রেমিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতীত দেখে যান চুপচাপ, অর্জুনের তাই মনে হল।

লাল মোটরবাইকে চেপে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অর্জুন হেসে ফেলল। হরিপদ সেন চেয়েছিলেন কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোন-কোন অঞ্চলে ছিলেন এবং সেখানে ওই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন জায়গা আছে কি না যেখানে সোনাদানা পুঁতে রাখা সম্ভব, তা খুঁজে বের করে দিতে। সারের সঙ্গে কথা বলে তার ধারেকাছে যাওয়া গেল না। শুধু কালাপাহাড় সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ছবি পাওয়া গেল, আর সেইসঙ্গে বাঙালির ইতিহাস। অবশ্য অমল সোম শুধু এটুকুই চেয়েছিলেন।

কদমতলার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে সে অবাক। হাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অমলদার এই স্বাস্থ্যবান বোবা-কালা কাজের লোকটিকে খুব ভালবাসে অর্জুন। তাকে দেখামাত্র হাবু হাত-পা নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল অমলদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বোঝামাত্র হাবুকে পেছনে বসিয়ে মোটরবাইক ঘুরিয়ে হাকিমপাড়ার দিকে ছুটে গেল অর্জুন। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

নোয়ার জাহাজের রহস্য

নোয়ার জাহাজের কাহিনী অথবা আটলান্টিসের গল্পের কি সত্যি কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে ? সত্যিই কি ওই সময়ে বিধ্বংসী কোনও বিপর্যয় হয়েছিল ? কানাডার ফিজিক্যাল জিওগ্রাফার জন শ' সম্প্রতি নতুন করে আবার বলেছেন, "হ্যাঁ, গল্পগুলো একেবারে ভিত্তিহীন নয় ।"
ওণ্টারিওর কুইন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ'-এর ধারণা, সাম্প্রতিকতম যে হিমযুগ পৃথিবীতে

এসেছিল সেই সময়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক তাপকে বন্দী করে ফেলেছিল অতিকায় হিমবাহের চাদর । অভ্যন্তরের সেই তাপ ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে গলিয়ে ফেলেছিল হিমবাহের নীচের দিকের স্তরগুলো । হিমযুগে এই বরফের স্তর আবৃত করেছিল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বেশিরভাগ অংশ । অতি সম্প্রতি, অর্থাৎ বারো হাজার বছর আগে, যখন বরফের আবরণ সরে যায় তখন বন্দী জলভাণ্ডার মুক্তি পেয়ে ঘটে যায় বেপরোয়া বিধ্বংসী বন্যা । উত্তর আমেরিকার সমস্ত নদী, অতলান্তিক মহাসাগর এবং মেক্সিকোর উপসাগর ভেসে যায় জলের তোড়ে । মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সারা পৃথিবীর সমুদ্রতল এগারো ইঞ্চি বেড়ে যায় । সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নোয়ার জাহাজ অথবা সাগরতলে তলিয়ে যাওয়া মহাদেশের কাহিনীকে একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।

ভিনগ্রহীদের ডাকে

ভিনগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর অনুসন্ধান—সংক্ষেপে যার নাম 'সেটি'—নিয়ে একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' । আগামী ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বাড়তি চার কোটি ডলার খরচ করা হবে সেটি গবেষণার জন্য । আমাদের সৌরজগতের কাছাকাছি আটশো তারাকে চিহ্নিত করেছেন নাসা-র বিজ্ঞানীরা । এই তারাগুলোর সঙ্গে আমাদের সূর্যের অনেকটাই মিল । সুতরাং এইসব তারার বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে কোনও-কোনওটায় থাকতে পারে বুদ্ধিমান প্রাণী । আর আমাদের মতো তারাও হয়তো ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে নিয়মিত বেতার-সঙ্কেত ছুঁড়ে দিচ্ছে মহাকাশে । এই পরিপ্রেক্ষিতে নাসা একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে : কোনও ভিনগ্রহীর বেতার-সঙ্কেত আমাদের কাছে ধরা পড়লে আমরা কি তার পালটা জবাব দেব ? জানিয়ে দেব আমাদের অস্তিত্ব ?
এই প্রশ্নের উত্তরে নাসা একটি নথি প্রকাশ করেছে । তার নাম, 'ডিক্লেয়ারেশন অব প্রিন্সিপ্‌লস্' । অর্থাৎ, যখন ভিনগ্রহের সঙ্কেত অনুসন্ধানরত কোনও বিজ্ঞানী সত্যিকারের কোনও বেতার-সঙ্কেত পাবেন, তখন তাঁর প্রথম কাজ হবে গোপনীয়তা রক্ষা করে বারবার সঙ্কেতটি যাচাই করে দেখা । সঙ্কেতটি যে ভিনগ্রহ থেকে আসছে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর এই আবিষ্কারের খবর জানাতে হবে সারা পৃথিবীর অন্য পর্যবেক্ষকদের । খবর জানানোর কাজটি সম্পন্ন হবে ওয়াশিংটন ডিসি-র ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন পরিচালিত একটি বিশেষ হটলাইনের মাধ্যমে । এর পরের প্রশ্ন : সঙ্কেতের কি উত্তর দেওয়া

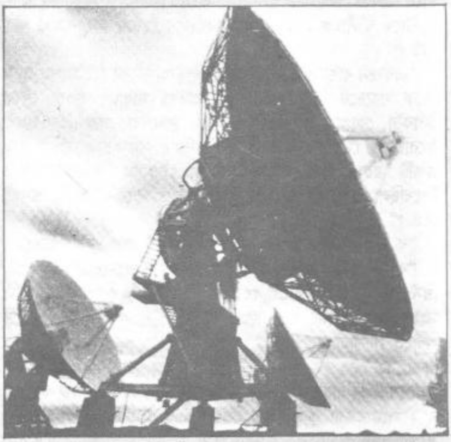

হবে ? এ-বিষয়ে নাসা প্রকাশিত নথি বলছে, "না, কোনও উত্তর নয় ।" বরং নাসার প্রস্তাব হল, পৃথিবীব্যাপী বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভিনগ্রহীদের ডাকে আমরা সাড়া দেব কি না ।

ক্ষতস্থান সেলাই করতে রুপো

ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে নাইলনের তুলনায় রুপো অনেক ভাল । নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ চিহ্‌-চ্যাঙ-চু-র গবেষণা সে-কথাই প্রমাণ করেছে । রুপোর সুতোর ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলার ক্ষমতা ও আনুষঙ্গিক গুণাগুণ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন চু । তাঁর বক্তব্য হল, রুপোর মধ্যে যে জীবাণুরোধী ধর্ম রয়েছে এ-কথা বহুকাল ধরেই মানুষের জানা । সুতরাং যেসব ক্ষতস্থান জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেক্ষেত্রে রুপোর সুতো দিয়ে ক্ষতমুখ সেলাই করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে । কিন্তু রুপোকে পুরোপুরি জীবাণুরোধী করার আসল কৌশলটি হল রুপোর সুতোকে তড়িতাহিত করে দেওয়া । এইটাই হল চু-র আশ্চর্য আবিষ্কার । নাইলন সুতোর ওপরে রুপোর আস্তরণ লাগিয়ে যদি তার মধ্যে দিয়ে সামান্য পরিমাণে তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হয়, তা হলে রুপোর আয়ন মুক্ত হয়ে পড়ে । জীবাণুরোধী এই আয়নগুলো ক্ষতমুখে ঘুরে বেড়ায় এবং সংক্রমণের হাত থেকে রোগীকে বাঁচায় । গুরুতর ক্ষতের জন্য এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অনেক ভাল বলে চু দাবি করেছেন ।

লাল, নীল, হলদে—এই

মজার খেলা মেট্রো

লাল, নীল, আর হলদে—এই তিন রঙের বল নিয়ে নতুন ধরনের একটি মজার খেলার নাম 'মেট্রো' । এই খেলায় প্রত্যেক রঙের দুটি করে মোট ছ'টা ছোট ছোট বল রয়েছে । আর 'টি' অক্ষরের মতো চেহারার তিনটি অংশ রয়েছে—এদের রংও তিন রকমের : লাল, নীল এবং হলদে । প্রত্যেকটি টি-র সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটি করে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আধার—যাতে বলগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় । প্রত্যেকটি রঙিন টি পরস্পরের সঙ্গে টানেলের সাহায্যে যুক্ত । টানেলগুলো কালো রঙের, স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো । সুতরাং খেলনাটিকে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে রঙিন বলগুলো টানেলের মধ্যে

অভিনব বাজনা

নাম 'হর্ন ম্যাজিক'। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে নানারকম সুর তুলতে পারে। এর মূল রহস্য হল ভেতরের মাইক্রোচিপযুক্ত ইলেকট্রনিক বর্তনি। ট্রাম্পেট, বিউগল, ট্রম্বোন, টুবা, ফ্রেঞ্চ হর্ন, কর্নেট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের স্বর ও সুর সহজেই নকল করতে পারে হর্ন ম্যাজিক। অভিনব এই ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছে ফিলাডেলফিয়ার নাস্টা কম্পানি। দাম প্রায় চল্লিশ ডলার।

স্বয়ংক্রিয় খুদে বেলুন

মার্কিন আবিষ্কারক চার্লস গুডইয়ার ১৮৩৯ সালে আবিষ্কার করেছিলেন ভালকানাইজড রবার। ১৮৪৪-এ এই রবার তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতির পেটেন্ট নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পদ্ধতিটি এতই সহজ ছিল যে, আট বছর ধরে প্রায় ষাটজন নকলনবিশের সঙ্গে পেটেন্ট আত্মসাৎ করার কারণে মামলা করতে হয় গুডইয়ারকে। পরে অবশ্য তাঁর যথাযোগ্য সম্মান তিনি পেয়েছিলেন এবং তাঁর নামে তৈরি হয় বিখ্যাত টায়ার কম্পানি। এই চার্লস গুডইয়ারেরই নামে নামাঙ্কিত বেলুন 'গুডইয়ার' যখন আকাশে উড়েছিল তখন হইহই পড়ে গিয়েছিল পশ্চিমের জগতে। সম্প্রতি গুডইয়ার বেলুনের খুদে সংস্করণ তৈরি করেছে আমেরিকার কানসাস সিটির পাইওনিয়ার বেলুন কম্পানি। সাড়ে চার ফুট লম্বা এই বেলুনটিতে ভরা রয়েছে হিলিয়াম গ্যাস। এ ছাড়া পনেরো ফুট লম্বা তারের শেষপ্রান্তে রয়েছে এর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। সুতরাং আকাশে বেলুন ওড়ানোর তালিম নিতে পঞ্চাশ ডলার দামের এই খুদে সংস্করণ উৎসাহী ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট কাজে আসবে।

জেড-বল

নাম জেড-বল। এর ছ' দিকে ছ'টা অর্ধগোলক উঁচু হয়ে আছে—হাফ ডজন বলের মতো। ফলে পিভিসি দিয়ে ছাঁচে ঢালাই করা হলদে রঙের এই বল কোথাও ছুঁড়ে দিলে ধাক্কা খেয়ে লাফ দেয় এলোমেলোভাবে। ঠোকর খাওয়ার পর কোনদিকে যে লাফ দেবে তার কোনও ঠিক নেই। আর এইরকম ঘটনা ঘটবে প্রতিবারের ঠোকরেই। সুতরাং ক্ষিপ্রতার পরীক্ষা করতে খেলোয়াড়েরা এই বল নিয়ে অনুশীলন করতে পারেন। বিশেষ করে টেনিস, বাস্কেটবল, বেসবল আর আইস হকির খেলোয়াড়েরা ইতিমধ্যেই জেড-বল ব্যবহার

করতে শুরু করেছেন। বলটি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ানাপোলিসের ফাগেক্স কম্পানি। দাম দশ ডলার।

ঙের বল নিয়ে নতুন খেলা 'মেট্রো'…

দিয়ে বিভিন্ন স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আধারে ধীরে-ধীরে চলে যাবে। খেলোয়াড়ের কাজ হল রঙিন বলগুলোকে নির্দিষ্ট রঙের টি-র আধারে নিয়ে যাওয়া। যেমন ছবিতে একটি নীল বল ও দুটি লাল বলকে সঠিক জায়গায় দেখা যাচ্ছে। খেলনাটি তৈরি করেছে আমেরিকার আলেকজান্দ্রিয়া বাইনারি আর্টস কম্পানি। এর দাম এমন-কিছু বেশি নয়। পনেরো ডলারেরও কম।

দাঁতের এক্স-রে

মুখের বাইরে অথবা ভেতর থেকে দাঁতের নিখুঁত এক্স-রে ছবি তুলতে একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করেছে সিমেন্স কম্পানি। এই যন্ত্রে প্রচলিত সিঙ্গল-পালস পদ্ধতির বদলে মাল্‌টি-পালস্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে রোগীর শরীরে এক্স-রে প্রয়োগের সময়ের পরিমাণ কমে গেছে, আর তেজস্ক্রিয় মাত্রাও কমে গেছে শতকরা কুড়ি ভাগ। এই যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিভব প্রভেদ হল ষাট থেকে সত্তর কিলোভোল্ট। সাধারণত যেসব যন্ত্রের সাহায্যে দাঁতের এক্স-রে করা হয়, তাতে এক্স-রে প্রয়োগের সময় ১০ মিলিসেকেণ্ড থেকে ৩·২ সেকেণ্ড। সিমেন্সের এই নতুন যন্ত্রে সময় লাগে ১০ মিলিসেকেণ্ডেরও কম। ফলে রোগীর ক্ষতির আশঙ্কাও অনেক কমে গেছে।

প্রচ্ছদকাহিনী

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পাথরের আড়ালে

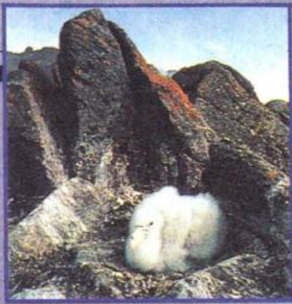

কুমেরুর অভ্যন্তরে

আজ থেকে আনুমানিক কুড়ি কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরুর জন্ম । তখন পৃথিবীতে ছিল দুটি 'সুপারকন্টিনেন্ট' বা 'অধিমহাদেশ'—উত্তরে লাউরেশিয়া ও দক্ষিণে গন্ডোয়ানাল্যান্ড । কুমেরু মহাদেশ ছিল এই গন্ডোয়ানাল্যান্ডেরই অংশ । এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ন' হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার এই মহাদেশের প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা থাকে সারা বছর । মাত্র দুই শতাংশ এলাকায় আছে কিছু মাটি । সৃষ্টিরহস্যের অনেক অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে এই কুমেরুর অভ্যন্তরে ।

লিখেছেন স্বপনকুমার দাস

এই মুহূর্তে একদল দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোথায় যেতে চান ? অধিকাংশই উত্তর দেবেন অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু । শুধু অভিযাত্রীই বা কেন, ভূতাত্ত্বিক, জীববিদ, রসায়নবিদ, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, সকলের কাছেই অ্যান্টার্কটিকার আকর্ষণ দুর্নিবার । আশ্চর্যের ব্যাপার, অ্যান্টার্কটিকার অস্তিত্ব জানা গেছে উনিশ শতকে । অথচ তিন হাজার বছর আগে থেকেই গ্রিক দার্শনিকরা এরকম কোনও এক মহাদেশের কথা শুনিয়েছেন । তাঁদের যুক্তি ছিল, উত্তর মেরুর উলটো দিকে একটা দক্ষিণ মেরু তো থাকতেই হবে । আর যেহেতু পৃথিবী গোলাকার এবং বেশিরভাগ দেশ-মহাদেশই উত্তর গোলার্ধে ছড়ানো, এই গ্রহের ভারসাম্য ঠিক রাখতেই দক্ষিণ গোলার্ধে জুড়ে প্রকাণ্ড এক মহাদেশ থাকা উচিত । দক্ষিণ মেরু

ভাসমান বিপজ্জনক বরফ-পাহাড়   *ফোটো : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত*

ছোট্ট পেঙ্গুইনের সুখের সাম্রাজ্য

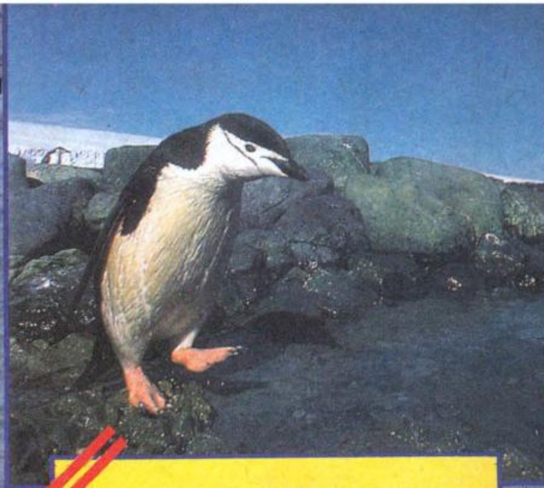

নিষ্কলুষ আবহাওয়ার জন্য অ্যান্টার্কটিকায় দৃষ্টি চলে অনেকদূর, দূরের পাহাড় মনে হয় নাগালের মধ্যে । চোখে ধাঁধা লাগায় মরীচিকা । আর এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হয় আকাশে, যাকে বলা হয় 'পারহেলিয়া' বা 'সান-ডগ' । সূর্যের জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল সাদা বা লালচে এক সূর্যের প্রতিবিম্ব । হঠাৎ দেখলে মনে হবে আকাশে রয়েছে জোড়া সূর্য । একই অবস্থা চাঁদেরও । সে মাঝে-মাঝে নিজের প্রতিবিম্ব 'মুন-ডগ' বা 'পারাসেলিন' নিয়ে হাজির হয় ।

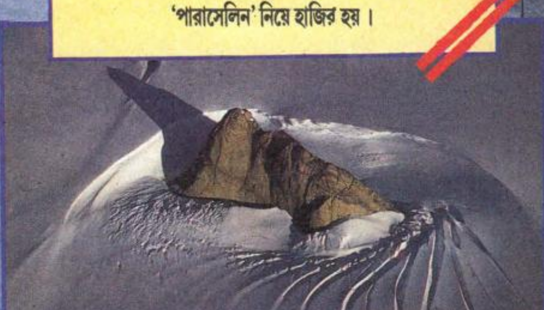

ঢেউয়ের মতো অগণ্য পাহাড় আছে কুমেরুতে *ফোটো : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত*

উলথাট পর্বত ফোটো : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

রয়েছে অজানা সেই মহাদেশে ।

মিশরীয় ভৌগোলিক টলেমি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে অজ্ঞাত মহাদেশটির নাম রাখেন 'টেরা অস্ট্রালিস ইনকগনিটা' (Terra Australis Incognita) বা 'দক্ষিণের অজ্ঞাত মহাদেশ' । 'অ্যান্টার্কটিকা' নামটি আরও পুরনো । গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) রাখা এই নামের মানে দাঁড়ায় 'ভালুকের দেশ' বা 'আর্কটিকে'র ('Arktos' মানে ভালুক) বিপরীতে ।

আজ থেকে আনুমানিক কুড়ি কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকার জন্ম । সেই সময়ে পৃথিবীতে ছিল দুটি অধিমহাদেশ বা সুপার কন্টিনেন্ট —উত্তরে লাউরেশিয়া আর দক্ষিণে 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' । এদের মধ্যে ছিল এক প্রাচীন সমুদ্র 'টেথিস' । আজকের সব মহাদেশই ওই দুটি অধিমহাদেশের অংশ । লাউরেশিয়ার বিভাজনে সৃষ্টি হয়েছে এশিয়া, ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা । অপরদিকে অস্ট্রেলেশিয়া, ভারত, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যান্টার্কটিকার উৎপত্তি গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে ।

সৃষ্টির পর থেকেই মহাদেশগুলো ক্রমাগত ঠাঁই বদল করেছে । উত্তর আমেরিকা এশিয়া-ইউরোপকে ছেড়ে সরে গেছে পশ্চিমে, নতুন করে মিতালি পাতিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে । আফ্রিকা জোট বেঁধেছে ইউরেশিয়ার সঙ্গে, অস্ট্রেলেশিয়া ভেসে গেছে পূর্ব দিকে আর ভারত এশিয়ার দক্ষিণ সীমানায় চমৎকার এঁটে গেছে ।

অ্যান্টার্কটিকার ধরন-ধারণ প্রথম থেকেই

নেলসন দ্বীপের সিল

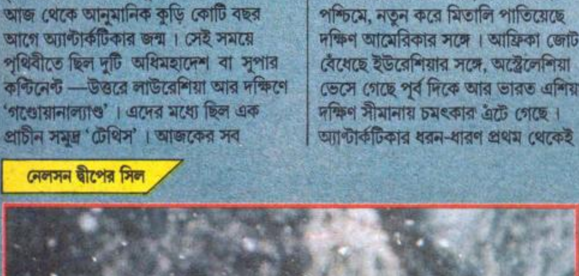

সৃষ্টিছাড়া। সেই সময় থেকেই অ্যান্টার্কটিকা অনন্য, সকলের মায়া ত্যাগ করে সে সরে গেছে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। তার যাত্রা থেমেছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তটিতে এসে। মহাদেশগুলোর এই অন্তহীন ভেসে যাওয়া পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। এর আভিধানিক নাম 'কন্টিনেন্টালড্রিফ্ট থিয়োরি'।
অ্যান্টার্কটিকা কি সত্যিই মহাদেশ, না কি জমাট বরফে ঢাকা ছোট-বড় অগণিত দ্বীপের সমষ্টি ? এই প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খেয়েছে বহুদিন। ১৮৪২ সালে অ্যান্টার্কটিকা অভিযান সেরে স্বদেশে ফিরে আমেরিকার নৌবাহিনীর অফিসার চার্লস উইলকিস সর্বপ্রথম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন এটি এক মহাদেশ।
বিশাল আয়তনের, হিসেবমতো এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ন'হাজার বর্গকিলোমিটারের এই মহাদেশের প্রায় সবটাই বরফঢাকা থাকে বছরভর। মাত্র দুই শতাংশে দেখা যায় ন্যাড়া মাটি। মহাদেশটিকে ঘিরে আছে তিন মহাসমুদ্র—প্রশান্ত, অতলান্তিক আর ভারত মহাসাগরের দক্ষিণতম অংশ।
অ্যান্টার্কটিকাকে মোটামুটি পূর্ব, পশ্চিম, উপদ্বীপ অঞ্চল এবং চারপাশে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপঅঞ্চলে ভাগ করা হয়। ভূতাত্ত্বিক বিচারে পূর্ব-অ্যান্টার্কটিকার থেকে পশ্চিমের বয়স কম। আঙুলের মতো দেখতে অ্যান্টার্কটিকা উপদ্বীপটি পশ্চিম অংশের সঙ্গেই যুক্ত। জানা

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি

'ম্যাগেলানিক' পেঙ্গুইনরা আছে দল বেঁধে

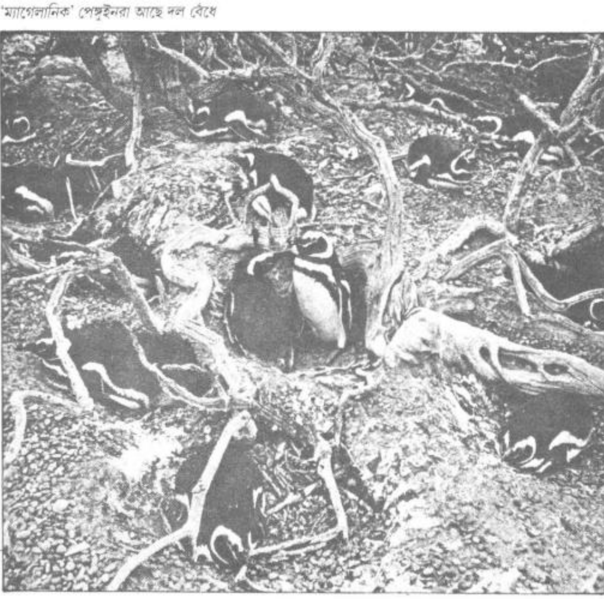

গেছে পূর্ব-অ্যান্টার্কটিকা এক নিরবচ্ছিন্ন স্থলভূমি হলেও পশ্চিম অংশটি আসলে অনেক মহাকায় দ্বীপের সমষ্টি।
অন্য সব মহাদেশের থেকে অ্যান্টার্কটিকা উঁচু। এর সমস্তটা জুড়েই রয়েছে ছোট-বড় পাহাড়-পর্বত, মালভূমি আর উপত্যকা। আর ভূস্তরের ওপর জমে আছে দেড় কিলোমিটার (প্রায় এক মাইল) পুরু বরফের আচ্ছাদন। মহাদেশটির সব পর্বতমালার গড় উচ্চতা এক হাজার আটশো ত্রিশ মিটার। উচ্চতম শৃঙ্গ—এলসওয়ার্থ পর্বতমালার ভিনশন ম্যাসিফ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার একশো উনচল্লিশ মিটার ওপরে।
মহাদেশটির মধ্যভাগ অনেকটা গম্বুজের মতো, উচ্চতায় চার হাজার মিটার। এরই ওপরে রয়েছে 'অগম্য দক্ষিণ মেরু'। একে অত উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম, তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীতের সময়ে তাপমাত্রা প্রায়ই হিমাঙ্কের নীচে ৬০-৭০° সেলসিয়াসে নেমে যায়। অগম্য দক্ষিণ মেরু অবশ্য সত্যিকারের দক্ষিণ মেরু নয়। প্রকৃত

মেরু রয়েছে এর থেকে দুশো চুয়াল্লিশ কিলোমিটার (প্রায় চারশো মাইল) দূরে। অ্যান্টার্কটিকার বাতাস জলীয় বাষ্প ধারণ করে রাখতে অক্ষম। বৃষ্টি এবং তুষারপাত হয় না বললেই চলে। খুব বেশি হলে বছরে তেরো সেন্টিমিটারের (পাঁচ ইঞ্চি) মতো বৃষ্টি হয়। এদিক থেকে বিচার করলে অ্যান্টার্কটিকা এক সুবিশাল অতিশীতল মরুভূমি।

উত্তর মেরুর তুলনায় কমপক্ষে ছ' গুণ বেশি বরফ জমাট বেঁধে আছে অ্যান্টার্কটিকায়। এই বরফস্তর অবশ্য সারা বছর একই থাকে না। গরম হাওয়া বইতে শুরু করলেই বরফ গলতে থাকে। সমুদ্র কিনারে ঝুঁকে থাকা পাটাতন বা 'আইসশেল্ফ' থেকে গলা বরফ বছরে সাড়ে সাতশো মিটার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এই হিসেবে দক্ষিণ মেরুতে গলা বরফের স্তূপ সমুদ্রে পৌঁছতে সময় নেবে এক হাজার বছর।

অতিশীতল আবহাওয়ার জন্য বরফের স্তূপ সমুদ্রে পড়ার পরেই একেবারে গলে যায় না। সমুদ্রের ওপর প্রলম্বিত হয়ে তৈরি করে বিশাল বরফের আইসশেল্ফ। এভাবেই পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকা থেকে রস সমুদ্রের ওপর সৃষ্টি হয়েছে বিখ্যাত 'রস আইসশেল্ফ'। ছ'শো চুয়াল্লিশ কিলোমিটার লম্বা এবং সমুদ্রের ওপর আটশো পাঁচ কিলোমিটার প্রলম্বিত এই আইসশেল্ফ আয়তনে ফ্রান্সের সমান।

সাগরজলের স্পর্শে আইসশেল্ফের বাইরের কিনারা একদিন ভাঙতে শুরু করে। হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার হয়ে ভাসতে থাকে সমুদ্রে।

ঠাণ্ডা জলে ভাসছে কুমেরুর অতিকায় তিমি

পরিবেশ-দূষণ বাড়ছে কুমেরুতে

কুমেরু অভিযাত্রীদের মধ্যে যেসব ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম পুরোভাগে, তাঁদের মধ্যে ডঃ *সুদীপ্তা সেনগুপ্ত* অন্যতম। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গৌতম চক্রবর্তী**

প্রশ্ন : আপনি তো দু'বার অ্যান্টার্কটিকা গিয়েছিলেন—
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, দু'বার। প্রথমবার গিয়েছিলাম তৃতীয় অভিযাত্রী দলের সদস্য হয়ে। আর, শেষবার গেছি নবম অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসেবে।

প্রশ্ন : আপনি কি দু'বারই গেছেন অ্যান্টার্কটিকায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য ?
সুদীপ্তা (হেসে) : হ্যাঁ, ওটাই তো আমার বিষয়!

প্রশ্ন : কতদিন ছিলেন অ্যান্টার্কটিকায় ?
সুদীপ্তা : প্রথমবার গিয়েছিলাম '৮৩-'৮৪ সালে। সেবার গোয়া থেকে আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল ১৯৮৩-এর ৩ ডিসেম্বর, গোয়াতে ফিরেছিলাম ১৯৮৪-এর ২৯ মার্চ।

প্রশ্ন : আর এবার ?
সুদীপ্তা : এবার জাহাজ ছেড়েছিল ১৯৮৯-এর ৩০ নভেম্বর, ফিরেছি এ-বছর ২৭ মার্চ।

প্রশ্ন : তা হলে তো ঠিকই আছে। এবারেও চার মাস ছিলেন—
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, ওই চার মাস। এবার অবশ্য যেতে দু'দিন বেশি লেগেছে খারাপ আবহাওয়ার জন্য।

প্রশ্ন : ভারত তো ন'টি অভিযান চালিয়েছে অ্যান্টার্কটিকায় ?
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, টেন্‌থ টিমটা এখনও রওনা হয়নি।

প্রশ্ন : তা হলে অ্যান্টার্কটিকার সাম্প্রতিকতম খবর আপনি নিয়ে এসেছেন, বলা যায়।
সুদীপ্তা (হেসে) : ন' নম্বর অভিযানটাই যেহেতু এখন পর্যন্ত শেষ অভিযান, সুতরাং তা তুমি বলতে পারো।

প্রশ্ন : দু'বার অনেকেই অ্যান্টার্কটিকায় গেছেন। অমিতাভ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র সেনগুপ্তও তো দু'বার অ্যান্টার্কটিকা গিয়েছিলেন ?
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, এখন তো অ্যান্টার্কটিকা একটা রুটিন-এক্সপিডিশন। প্রতি বছর বিজ্ঞানী, সৈনিক সবাই যাচ্ছেন।

প্রশ্ন : তবু, থার্ড এক্সপিডিশনটা দুটো কারণে আমাদের মনে আছে। অ্যান্টার্কটিকায় ভারতের প্রথম রিসার্চ-স্টেশন 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' সেবারই তৈরি হয়েছিল।
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, দক্ষিণ গঙ্গোত্রী তো আমাদের নিজের হাতে গড়া।

প্রশ্ন : দ্বিতীয়ত, ভারত সেবারই প্রথম দু'জন মহিলা-বিজ্ঞানীকে অ্যান্টার্কটিকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একজন আপনি। আর-একজন বোধ হয় ডঃ অদিতি পন্থ।
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, অদিতি তো আমার খুবই বন্ধু।

প্রশ্ন : উনিও কী দু'বার অ্যান্টার্কটিকায় গেছেন ?
সুদীপ্তা : হ্যাঁ। ফিফ্‌থ এক্সপিডিশনে ও ছিল। খুব মজার ব্যাপার, না ? এতদিন আমরাই ছিলাম অ্যান্টার্কটিকায় প্রথম পৌঁছনো ভারতীয় মহিলা। এবার, আমরাই অ্যান্টার্কটিকায় দু'বার যাওয়া ভারতীয় মহিলা-বিজ্ঞানী।

প্রশ্ন : তা হলে এবার বিজ্ঞানী হিসেবে একটা কারণ বলুন। অ্যান্টার্কটিকার প্রতি লোকের এই আকর্ষণ কেন ? শুধুই অজানা, দুর্গমকে জয় করার ইচ্ছে ?
সুদীপ্তা : অ্যান্টার্কটিকার প্রতি আকর্ষণের তো একটা কারণ নেই, অনেক কারণ আছে। আর, ওই অজানাকে জানার চেষ্টা চলেছে ১৯৫৯ সাল অবধি।

প্রশ্ন : কেন, সে-বছর কী হয়েছিল ?

কুমেরু মহাদেশে বিজ্ঞানী ডঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

এমনিতে অ্যান্টার্কটিকার হিমবাহ প্রকাণ্ড আকারের। দু' হাজার ছ'শো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এবং তিনশো মিটার পুরু হিমবাহ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।
শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে গেলেই সমুদ্রের জল জমতে শুরু করে, তৈরি হয় 'প্যাক আইস'। অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে আছে চল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার থেকে দু' কোটি কুড়ি লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের এক প্যাক আইস বৃত্ত। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে কিছু প্যাক আইস গলে যায়, আবার নতুন করে তৈরি হয়। বাতাসের ধাক্কায় প্যাক আইস দিনে প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার গতিতে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। একসময়ে দুটি বিশাল প্যাক আইসের মধ্যে ধাক্কা লাগে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় দুটি স্তূপই। অ্যান্টার্কটিকায়

সুদীপ্তা : ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ইয়ার। সেবারেই তৈরি হয়েছিল অ্যান্টার্কটিকা-চুক্তি। ঠিক হয়েছিল, প্রতিটি দেশ সম্মিলিতভাবে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে একে অন্যকে সাহায্য করবে। বিজ্ঞানের সব শাখায় অ্যান্টার্কটিকায় চলবে সম্মিলিত অভিযান। '৫৯ সালের আগে যেটা অ্যান্টার্কটিকায় হত, সেটা ভৌগোলিক আবিষ্কার। এক-একটা দেশের এক-একদল অভিযাত্রী অ্যান্টার্কটিকায় পৌঁছলেন, একটা দ্বীপ আবিষ্কার করলেন, কেউ দেখলেন আগ্নেয়গিরি, এরকম সব ব্যাপার।

প্রশ্ন : অর্থাৎ স্কট, শাকলটন, আমুণ্ডসেনের দিন শেষ। অ্যান্টার্কটিকায় এখন বিজ্ঞানীদের রাজত্ব।

সুদীপ্তা : ঠিক তাই।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানীদের এই আগ্রহের কারণটা কী? উত্তর মেরুর তুলনায় দক্ষিণ মেরুর প্রতি কেন তাঁদের এই পক্ষপাত?

সুদীপ্তা : কারণ, উত্তর মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য। সুমেরু একটা বিশাল মহাসাগর, সেই মহাসাগর ঘিরে রয়েছে কয়েকটা ছোট-ছোট দেশ। উত্তর কানাডা, গ্রিনল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি। অন্যদিকে, কুমেরু হল পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে বিশাল এক বরফ-ঢাকা মহাদেশ। সুমেরুতে এ-জাতীয় কোনও 'ল্যাণ্ডমাস' নেই, সেখানে তো শুধুই মহাসাগর।

প্রশ্ন : তা হলে অ্যান্টার্কটিকাই পৃথিবীর একমাত্র 'পোলার কন্টিনেন্ট'?

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, ঠিকই। পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরু এবং চৌম্বক মেরুর কথা ভাবো। উত্তরের মেরুপ্রদেশ শুধুই মহাসাগর, আর দক্ষিণের মেরুপ্রদেশে মহাদেশ!

প্রশ্ন : তা হলে এই ল্যাণ্ডমাসটাই বিজ্ঞানীদের একমাত্র আকর্ষণ?

সুদীপ্তা : বরফ-ঢাকা এই মহাদেশ আসলে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ। একসময়, এটা সরে দক্ষিণে চলে এসেছিল।

প্রশ্ন : সে তো সব মহাদেশই একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট!

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, আমি কন্টিনেন্টাল

'জ্যাকাস' পেঙ্গুইন

ড্রিফ্‌ট-এর কথাই বলছি। অ্যান্টার্কটিকার এই বরফের আস্তরণের নীচে রয়েছে সোনা, খনিজ তেল, ইউরেনিয়াম, এইসব মূল্যবান ধাতু। প্রযুক্তিগতভাবে সমস্ত উন্নত দেশই চাইছে সেগুলো সংগ্রহ করতে। পৃথিবীর অন্য সব জায়গায় যখন খনিজ আকরিক শেষ হয়ে যাবে, তখন অ্যান্টার্কটিকার খনিজ পদার্থগুলি বণ্টন করে আরও কয়েকশো বছর চলবে। এই বণ্টন-ব্যবস্থার অংশীদার হতে চায় বিভিন্ন দেশ। তাই, প্রতিটি দেশের তরফে এত জোরদার অ্যান্টার্কটিকা অভিযান।

প্রশ্ন : ওই পুরু বরফের নীচে ড্রিলিং করে খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে কীভাবে?

সুদীপ্তা : সবই তো ভবিষ্যতের ব্যাপার। যখন খনিবিদ্যায় পৃথিবী এগিয়ে যাবে আরও বেশ কিছু দশক, তখনই অ্যান্টার্কটিকায় ওইসব খনি হবে। এখন তো বরফ আর রিসার্চ-স্টেশন ছাড়া কিছু নেই।

প্রশ্ন : অর্থাৎ, ভবিষ্যতে নিজের দেশকে শক্তিশালী করার জন্যই বিজ্ঞানীরা জনমানবহীন অ্যান্টার্কটিকাকে বিব্রত করা শুরু করেছেন!

সুদীপ্তা : দ্যাখো, ওটা তো এক-একটা দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা ওই ব্যাপারটা দেখছেন, কিন্তু তার বাইরেও তাঁদের অন্য লক্ষ্য আছে।

প্রশ্ন : কী সেই লক্ষ্য?

সুদীপ্তা : এইমাত্র বলেছি, পৃথিবীর

যাওয়ার পথে এই প্যাক আইসের পাঁচিল এক বিরাট বাধা। সুদূর অতীতকাল থেকে কত অভিযাত্রী জাহাজই যে এই প্যাক আইসের জাঁতাকলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।
সর্বক্ষণ অ্যান্টার্কটিকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া, মাঝে-মাঝে যার গতি দাঁড়ায় ঘণ্টায় তিনশো কিলোমিটারের বেশি। রেকর্ড ঠাণ্ডা ধরা পড়েছে ১৯৬০ সালের ২৪ অগস্ট, অ্যান্টার্কটিকার সোভিয়েত স্টেশন ভোস্তকে, ৮৮·৩° সেলসিয়াস। উপদ্বীপ অঞ্চল ছাড়া অ্যান্টার্কটিকায় খুব কম দিনই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপরে ওঠে।
পৃথিবী তার কক্ষপথে যে ঠিক খাড়াভাবে নেই তা অনেকেরই জানা। কক্ষপথের ওপরে

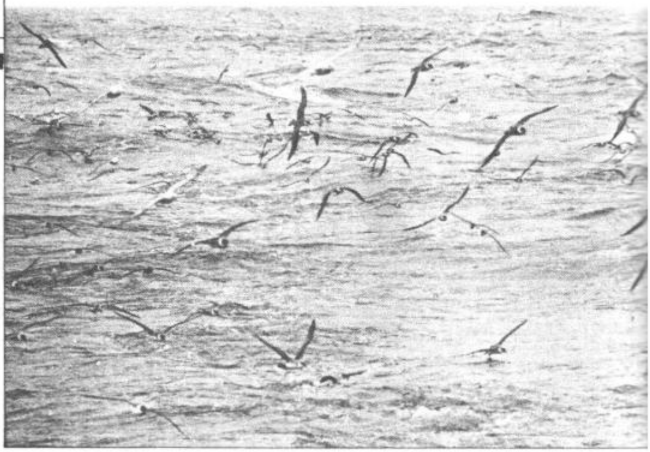

নানা জাতের পাখির মেলা

ভূ-চৌম্বক মেরুতে ওটাই একমাত্র মহাদেশ। উল্কা, মহাজাগতিক রশ্মি চৌম্বক মেরুর আকর্ষণে ওখান দিয়ে পৃথিবীতে ঢোকে। ওই বরফস্তরে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে সেগুলো অবিকৃত অবস্থায় ওখানে পড়ে আছে। সুতরাং, কসমিক রে, মিটিরিওলজি নিয়ে গবেষণা করতে গেলে ওটাই পৃথিবীর অন্যতম জায়গা।
প্রশ্ন : কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার মানুষই আজ অ্যান্টার্কটিকা যাচ্ছেন। শুধুমাত্র মিটিরিওলজিস্ট এবং জিওলজিস্টরা নন, আরও অনেকে।
সুদীপ্তা : অ্যান্টার্কটিকায় মাত্র দুই ভাগ ল্যাণ্ড। ন্যাড়া, প্রিক্যামব্রিয়ান পাললিক শিলা। বাকি ৯৮ ভাগ বরফ। পৃথিবীর সর্বত্র হিমযুগ ছিল। অক্সিজেন আইসোটোপ দিয়ে ওই বরফস্তরের বয়স, প্রকৃতি হিসেব করে পৃথিবীর প্যালিও-ক্লাইমেটিক কণ্ডিশন জানা যায়। শিলাস্তরে পাওয়া গেছে ক্রিটেসিয়াস যুগের প্রাণী প্লিসিওসরের ফসিল। পাওয়া গেছে পারমিয়ান যুগের গ্লসপটেরিস পাতার ফসিল। তাই, প্রত্নবিজ্ঞানীদের কাছেও জায়গাটার অদ্ভুত আকর্ষণ। হিমবাহ-বিজ্ঞানী বা গ্লেসিওলজিস্টদের আগ্রহ অন্য। কেন এখানেই বিশাল সব হিমশৈল দেখা যায়? জীববিজ্ঞানীদের আকর্ষণ অন্য জায়গায়। পেঙ্গুইন, ক্রিল, সিল এসব অদ্ভুত প্রাণী কীভাবে ওখানে বেঁচে আছে?
প্রশ্ন : সিল তো উত্তর মেরুতেও আছে।
সুদীপ্তা : আছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুর সিলদের সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য। দক্ষিণের সিল পুরোপুরি সামুদ্রিক, উত্তরের সিল তা নয়।
প্রশ্ন : এটা কি কোনও অভিযোজন-এর ব্যাপার?
সুদীপ্তা : নিশ্চয়ই। শীতের অ্যান্টার্কটিকায় সবই বরফ। প্রায় মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। ওই বরফের নীচে আবার জল, সেখানে তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি। অ্যান্টার্কটিকার সিল সেখানেই থাকে।
প্রশ্ন : দক্ষিণের সমুদ্রস্রোত অনেক ঠাণ্ডা···
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, সুমেরুতে সমুদ্র পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকাই পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ, উষ্ণমণ্ডলের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই।
প্রশ্ন : এই দ্বিতীয়বার আপনি অ্যান্টার্কটিকায় গেলেন ছ' বছর পর। কুমেরু নিশ্চয় এই ছ' বছরে অনেকটা বদলে গেছে।
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, সেবার আর এবারের অভিজ্ঞতায় অনেক তফাত।
প্রশ্ন : এবারেও কি জাহাজে গেলেন? সেই গোয়া থেকে?
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, 'থুলেলাণ্ড' বলে একটা সুইডিশ জাহাজে।
প্রশ্ন : গতবার তো গিয়েছিলেন ফিনল্যাণ্ডের একটা জাহাজে···
সুদীপ্তা : হ্যাঁ। 'ফিনপোলারিস' নাম ছিল জাহাজটার।
প্রশ্ন : একবার ফিনল্যাণ্ড, আর একবার সুইডেনের জাহাজ। অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের জন্য ভারতের নিজস্ব কোনও জাহাজ নেই?
সুদীপ্তা : ভারত কেন, চিন, জাপান অনেকেরই নেই। খরচ পোষায় না। এই জাহাজগুলো ভাড়া নেওয়া হয়। আর্কটিক সমুদ্র,

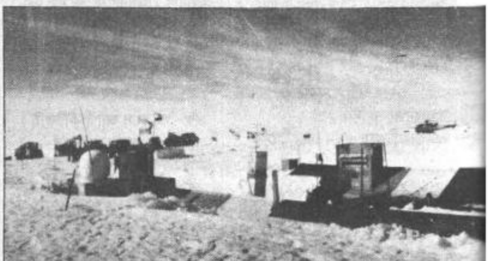

বরফে চাপা পড়েছে 'দক্ষিণ-গঙ্গোত্রী'

বাল্টিক সাগর এসব জায়গায় এরা যাতায়াত করে। ওই সমুদ্রগুলি শীতকালে বরফে জমে যায়, ফলে এই জাহাজগুলি বরফ কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। জাহাজগুলি বছরের অন্য সময় নিতান্ত মালবাহী জাহাজ হিসেবেই কাজ করে।
প্রশ্ন : কোন দিক দিয়ে গেলেন? মরিশাস হয়ে?
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, তবে গতবার আমরা মরিশাসে নেমেছিলাম। এবার নামিনি। শুধু, ওষুধপত্র নেওয়ার জন্য জাহাজটা কয়েক ঘণ্টা থেমেছিল।
প্রশ্ন : অর্থাৎ, প্রথম থেকেই আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এবারের যাত্রাটা গতবারের চেয়ে আলাদা···
সুদীপ্তা : হ্যাঁ, গতবার তো একটা রোমাঞ্চ ছিল। ইণ্ডিয়া অ্যান্টার্কটিকাতে প্রথম রিসার্চ-স্টেশন তৈরি করতে যাচ্ছে, সফল হবে কি না তা নিয়ে আগ্রহ আর জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই! গোয়াতে রাজ্যপাল নিজে এসে আমাদের বিদায় জানিয়েছিলেন, মরিশাসে রাষ্ট্রপতি অনিরুধ জগন্নাথ

একটা কাল্পনিক উল্লম্বরেখা টানলে দেখা যাবে, পৃথিবীর অক্ষরেখা তার সঙ্গে ২৩½° কোণ তৈরি করেছে। এর ফলে জুন মাসে উত্তর মেরু আর ডিসেম্বরে দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে মুখ ফেরানো থাকে। এইজন্যই বছরে অন্তত দু' মাস দিনরাতের কোনও ফারাক থাকে না এখানে। হয় চব্বিশঘণ্টাই সূর্য আকাশ পরিক্রমা সারছে, নয়তো সূর্যের মুখই দেখা যাবে না।

১৮ নভেম্বর থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অ্যান্টার্কটিকায় দিন, সূর্যের আলো সবসময়ই পাওয়া যায়। ২৫ জানুয়ারি প্রথম কিছুক্ষণের জন্য সূর্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর পর থেকে ক্রমশই কমতে-কমতে শেষে ২৫ মে থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত সূর্যের আলো একেবারেই দেখা যায় না। সূর্যকে ১৯ জুলাই খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়। তবে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ক্রমশই তাকে আরও বেশি সময় ধরে দেখা যেতে থাকে। রাত্রে অ্যান্টার্কটিকার আকাশ জুড়ে চলে লাল, সবুজ আর সাদা রঙের আলোকরশ্মি মিশিয়ে ইন্দ্রধনুর খেলা। এর পোশাকি নাম 'অরোরা অস্ট্রালিস' বা 'দক্ষিণ মেরুজ্যোতি'। অরোরার জন্ম ভূপৃষ্ঠ থেকে কমপক্ষে আশি কিলোমিটার ওপরে , আয়নোস্ফিয়ারে। সূর্য থেকে নির্গত তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের প্রভাবে উত্তেজিত হয় বিভিন্ন গ্যাসের পরমাণু, ছিটকে বেরোয় ইলেকট্রন। গ্যাসের এই আয়নিত অবস্থাই সৃষ্টি করে অরোরার অপার্থিব মায়াবী আলোকধারা। আকাশ জুড়ে অরোরা আর পায়ের নীচে চকচকে মসৃণ বরফে তারই প্রতিফলন—রাতের ক'মাস সারা

সোনা, রুপো, তামা, লোহা, সিসা, দস্তা, টিন থেকে আরম্ভ করে প্লাটিনাম, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়ামের মতো ধাতু মেলে এখানে। আছে তরল সোনা পেট্রোলিয়াম আর কালো হিরে কয়লার ভাণ্ডার। এসবের জন্য অ্যান্টার্কটিকা নিয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

নিজে আপ্যায়ন জানিয়েছিলেন, আর এবার তো নিতান্ত একটা রুটিন-ওয়ার্ক।

প্রশ্ন : তবু, অ্যান্টার্কটিকা তো একঘেয়ে নয়।

সুদীপ্তা : তা তো নিশ্চয় নয়। এবার আমরা ভালই যাচ্ছিলাম, বাধা পেলাম প্যাক-আইসের সামনে এসে। ওটাই ছিল এবারের প্রথম বাধা।

প্রশ্ন : আপনাদের জাহাজ নিশ্চয় প্যাক-আইস ভেঙে বেরিয়ে গেল ?

সুদীপ্তা : আমাদেরটা ছিল আইস- স্ট্রেংগদেনড (Ice-Strengthened) শিপ। এই জাহাজগুলো সবসময় প্যাক-আইসে ফাটল খোঁজে। খোঁজে বরফের স্তর কোথায় পাতলা। বরফের ওই দুর্বলতা খুঁজে বের করে জাহাজ সেই নরম জায়গায় ধাক্কা মেরে বরফ ফাটাতে-ফাটাতে এগিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আর, ওই দুর্বলতা খুঁজে না পেলে ?

সুদীপ্তা : জাহাজ তখন ঘুরে অন্যদিকে খুঁজতে থাকে কোথায় ফাটল আছে। স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবির মাধ্যমে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। আর, এবারের প্যাক-আইসের অবস্থা গতবারের চেয়েও খারাপ ছিল। এমনও দিন গেছে, যখন জাহাজ দিনে মাত্র দু-তিন কিলোমিটার এগিয়েছে।

প্রশ্ন : আপনাদের জাহাজ না হয় প্যাক-আইসে ফাটল খুঁজছে, কিন্তু 'আইস-কাটার' জাহাজগুলো তো বরফ কাটতে-কাটতে এগিয়ে যাচ্ছে।

'ওয়েডেল' সিল তার বাচ্চা নিয়ে

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, কিন্তু আইস-কাটারগুলো অনেক ছোট। তাতে অভিযান করা যায় না। আমাদের জাহাজে রয়েছে স্নো-ট্রাক্টর, চারটে হেলিকপ্টার। আইস-কাটারে এতসব ধরবেই না। আমেরিকানদের একটা আইস-কাটার জাহাজ আছে, প্যাক-আইস খারাপ থাকলে সেই জাহাজটা বরফ কেটে এগিয়ে রাস্তা করে, অন্য জাহাজ তার পেছনে-পেছনে চলতে থাকে।

প্রশ্ন : শেষ অবধি প্যাক-আইস ভাঙতে পারল জাহাজ ?

সুদীপ্তা : না, ওখান থেকে আমাদের জায়গা 'ভারতীয় উপসাগর' প্রায় ৭০ কিমি দূর। সেটা আমরা হেলিকপ্টারে অতিক্রম করলাম। পিস্টেন-বুলি বা স্নো-ট্রাক্টর থাকল জাহাজে। একমাস পর বরফ গলল, তখন জাহাজ পৌঁছল আইস শেল্ফে। তখনই ওসব নামানো হল। গতবার এই অভিজ্ঞতাটা আমার হয়নি।

প্রশ্ন : ছ' বছর পর অ্যান্টার্কটিকাতে পৌঁছে প্রথম চমকটা কী ছিল ?

সুদীপ্তা : দক্ষিণ গঙ্গোত্রী। '৮৪ সালে আমাদের নিজের হাতে গড়া দক্ষিণ গঙ্গোত্রী স্টেশন আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছে। এবার অ্যান্টার্কটিকাতে পৌঁছেই দেখলাম দক্ষিণ গঙ্গোত্রী স্টেশনটা প্রায় বরফে ডুবে গেছে। শুধু ছাদটা দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আর ?

সুদীপ্তা : গতবার ছিলাম তাঁবুতে। হাটমেন্ট বানিয়ে। তখন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গড়ার কাজ। আর এবার গিয়ে দেখলাম, শির্মাকার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের দ্বিতীয় রিসার্চ-স্টেশন 'মৈত্রী'। একটা গোটা বাড়ি, লোকজন, হইচই, সব মিলিয়ে অন্যরকম একটা পরিবেশ। গতবারের চেয়ে ভীষণ, ভীষণ আলাদা।

প্রশ্ন : মৈত্রী স্টেশন কবে উদ্বোধন হয়েছিল ?

সুদীপ্তা : ১৯৮৮-তে।

প্রশ্ন : দক্ষিণ গঙ্গোত্রী বরফে তলিয়ে গেল কেন ?

সুদীপ্তা : দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গড়া হয়েছিল আইসশেল্ফের ওপরে। আইসশেল্ফ ভূত্বকের চাপে আস্তে-আস্তে নীচে বসে যায়। আমরাও জানতাম দক্ষিণ গঙ্গোত্রী একদিন ডুবে যাবে বরফে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেটা হবে, ভাবতে পারিনি।

প্রশ্ন : মৈত্রীও কি তৈরি হয়েছে আইসশেল্ফে ?

সুদীপ্তা : না। শির্মাকার পাহাড়ের প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের পাথুরে জমিতে দাঁড়িয়ে আছে মৈত্রী। ওটা বরফে ডুবে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন : তা হলে প্রথমে আপনারা আইসশেল্ফ বাছলেন কেন ?

সুদীপ্তা : এটা নির্ভর করে দূরত্বের ওপর। ব্রিটিশ স্টেশন 'হ্যালি' তৈরি হয়েছে আইসশেল্ফে। ওটা প্রতিবার বরফে ডুবে যায়, প্রতিবার ব্রিটিশরা নতুন করে তৈরি করে। দক্ষিণ

অ্যান্টার্কটিকায় শুধুই রঙের খেলা। নিষ্কলুষ আবহাওয়ার জন্য অ্যান্টার্কটিকায় দৃষ্টি চলে অনেকদূর পর্যন্ত, দূরের পাহাড় মনে হয় নাগালের মধ্যে। চোখে ধাঁধা লাগায় মরীচিকা। আর এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হয় আকাশে, যাকে বলে 'পারহেলিয়া' (Parhelia) বা 'সান-ডগ'। সূর্যের জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল সাদা বা লালচে এক সূর্যের প্রতিবিম্ব। হঠাৎ দেখলে মনে হবে আকাশে রয়েছে জোড়া সূর্য। একই অবস্থা চাঁদেরও। সে মাঝে-মাঝে নিজের প্রতিবিম্ব 'মুন-ডগ' বা 'পারাসেলিন' (Paraselene) নিয়ে হাজির হয়।

বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় অ্যান্টার্কটিকায় শীত-গ্রীষ্মের হিসেবটি উলটো। মার্চ থেকে জুন, উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে যখন গরম, অ্যান্টার্কটিকা জুড়ে তখন চলছে শীতের পালা। আবার অক্টোবর থেকে জানুয়ারি, এই ক'মাস সেখানে গ্রীষ্মকাল।

কুড়ি কোটি বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা যখন ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছিল, উষ্ণমণ্ডলের গাছপালা আর জীবজন্তু বাস করত সেখানে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে অ্যান্টার্কটিকার মাটি খুঁড়ে। পাওয়া গেছে আদিম যুগের ফার্নগাছের পাতার ছাপ, মিলেছে 'লিস্ট্রোসর' নামের সরীসৃপ, 'মারসুপিয়াল' বা ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীর ফসিল।

খনিজ সম্পদেও অ্যান্টার্কটিকা ধনী। কী নেই এখানকার মাটির তলায়? সোনা, রুপো, তামা, লোহা, সিসা, দস্তা, টিন থেকে আরম্ভ করে প্লাটিনাম, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়ামের মতো ধাতু মেলে এখানে। এর সঙ্গে আছে 'তরল সোনা' পেট্রোলিয়াম আর 'কালো হিরে' কয়লার ভাণ্ডার। এসবের জন্য অ্যান্টার্কটিকা যেতে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

অ্যান্টার্কটিকায় ভয়াবহ পরিবেশেও জীবনপ্রবাহ কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বিবর্তনের অদৃশ্য কৌশলে সেখানে আস্তানা গেড়েছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ আর প্রাণীকুল, যারা ওই অতি-শৈত্যে দিব্যি নিজেদের স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকায় গাছপালা জন্মায় খুবই কম। সমস্ত মহাদেশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেও সমুদ্রকিনারে অল্প কিছু ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া একমুঠো মাটিও মিলবে না, গাছপালা জন্মাবে

গঙ্গোত্রী বরফে ডুবে যাওয়ার পর দেখা গেল শির্মাকার পাহাড় বেশ কাছে, সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে। তাই ঠিক হল, ওখানেই দ্বিতীয় স্টেশনটা গড়া হবে।

প্রশ্ন : অর্থাৎ দূরত্বটা যদি সত্তরের বদলে দেড়শো কিলোমিটার হত, তা হলে আইসশেল্ফেই আবার দ্বিতীয় স্টেশন গড়ে তোলা হত?

সুদীপ্তা : ঠিক তাই।

প্রশ্ন : ভারতের এখন তা হলে একটাই রিসার্চ-স্টেশন, মৈত্রী।

সুদীপ্তা : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : অন্যান্য দেশের ক'টা রিসার্চ-স্টেশন?

সুদীপ্তা : সবচেয়ে বেশি রাশিয়ার। দশটি স্টেশন। আর্জেন্টিনার নয়টি। ব্রিটেনের পাঁচটি স্টেশন। চিলি ও অস্ট্রেলিয়ার তিনটি। জাপানের আছে দুটি স্টেশন, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি।

প্রশ্ন : ভারতের অন্য কোনও স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেই?

সুদীপ্তা : আমাদের নাইনথ এক্সপিডিশন টিমের সঙ্গে আরও একটা দল এবার অ্যান্টার্কটিকা গিয়েছিলেন। ওঁরা দেখতে গিয়েছিলেন, ওয়েডেল সমুদ্রের ধারে, হ্যালি স্টেশনের কাছে কোথাও স্টেশন গড়ার জায়গা আছে কি না।

প্রশ্ন : নিস্তব্ধ, প্রাণহীন অ্যান্টার্কটিকার শির্মাকার পাহাড় তা হলে এখন ভারতীয়দের কোলাহলে পূর্ণ!

সমুদ্রবিহারে এসেছে এম্পারার পেঙ্গুইন

সুদীপ্তা (হেসে) : না, শুধু ভারতীয়রাই নন,আরও অনেকে আছেন। শির্মাকার পাহাড়েই আছে রুশ স্টেশন নোভোলাজারেভস্কায়া। আছে জার্মান স্টেশন। রুশ স্টেশনের থেকে আমাদের স্টেশন এখন মাত্র সাত কিলোমিটার দূর। প্রায়ই এই স্টেশনের লোকরা ওই স্টেশনে বেড়াতে যান।

প্রশ্ন : গতবার আপনারা শির্মাকারে ক্যাম্প করেছিলেন। এবার কোথায় করেছেন?

সুদীপ্তা : হামবোল্ট পাহাড়ে। মৈত্রী থেকে হামবোল্ট মাত্র ৮০ কিমি দূরে।

প্রশ্ন : শির্মাকার আর হামবোল্ট পাহাড়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

সুদীপ্তা : শির্মাকার অ্যান্টার্কটিকার উপকূলে ছোট্ট এক পাহাড়। ৫০০ ফুট উঁচু। হামবোল্ট আর একটু ভেতরে, মেইনল্যাণ্ডের দিকে। হামবোল্ট আসলে উলথার্ট গিরিশ্রেণীর এক শৈলশিরা। উলথার্ট প্রায় ৫০০০ বর্গকিমি জুড়ে বিশাল এক পর্বতশ্রেণী। গড় উচ্চতা ২০০০ ফুট।

প্রশ্ন : আপনি তো এবার অ্যান্টার্কটিকায় ছিলেন। আর এবারই এক বিশেষ দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। বীরেন শ্রীবাস্তব, অরুণ বেদি, ডঃ এ কে শর্মা—এই তিনজন বিজ্ঞানীর এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। নেভির একজন

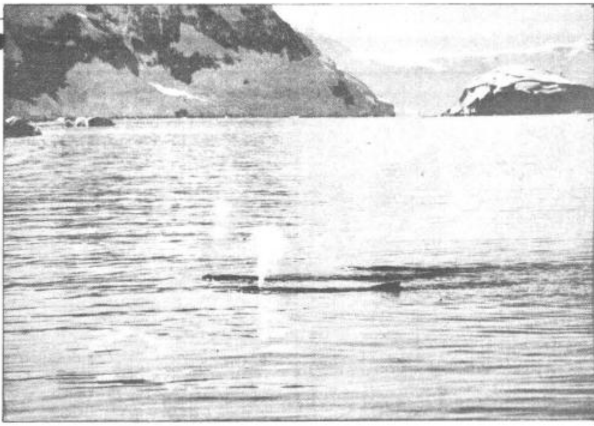

অনেক দ্বীপ থেকেই দেখা যায় তিমি ও জলের ফোয়ারা

কী করে ! এর সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর জলের অভাব তো আছেই। গাছের দরকার জল, বরফ কোনও কাজে আসে না। তবুও চার প্রজাতির লাইকেন (মিথোজীবি শ্যাওলা এবং ছত্রাকের সমন্বয়ে তৈরি সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ), পঁচাত্তরটি প্রজাতির মস আর চারটি প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে আছে তিন জাতের ঘাসজাতীয় গাছ, বাকিটি কার্নেশান ফুলের সমগোত্রীয়। এমনকী এখানকার জলে-স্থলে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাও খুবই কম। গরমের মাস ক'টিতে বরফ গলে গিয়ে অ্যান্টার্কটিকায় তৈরি হয় ছোটখাটো অস্থায়ী হ্রদ। শীতের ছোঁয়া লাগলেই আবার জমে ওঠে বরফ; হ্রদও মিলিয়ে যায় রাতারাতি তবুও ওইটুকু সময়ের মধ্যেই হ্রদের জলে

ক্যাপ্টেনও ওই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, ওঁরা আমাদেরই সহকর্মী ছিলেন। ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক।

প্রশ্ন : কীভাবে ওটা ঘটল ?

সুদীপ্তা : ওঁরা জিওলজিক্যাল ফিল্ড করার জন্য হামবোল্ট পাহাড়ে তাঁবু ফেলেছিলেন। কম্যুনিকেশনের জন্য একটা জেনারেটরও ছিল। কথা ছিল, জেনারেটরটা কিচেন-টেন্টে রাখার, কিন্তু কোনও কারণে ওটা লিভিং-টেন্টে রাখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : কী কারণ ?

সুদীপ্তা : কিচেন-টেন্টে ওঁরা রান্না করছিলেন। আমাদের লিডার রবীন্দ্রও ওঁদের সঙ্গে ছিলেন, সাতটা নাগাদ তিনি স্টেশনে ফিরে আসেন। রাত ন'টায় শ্রীবাস্তব মেইন স্টেশন মৈত্রীর সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু আমরা ভাল আছি।' পরের দিন দুপুর একটায় হেলিকপ্টার পৌঁছে দেখল, লিভিং-টেন্টে প্রাণহীন অবস্থায় চারজন পাশাপাশি শুয়ে।

প্রশ্ন : মৃত্যুর কারণটা কী ছিল ?

সুদীপ্তা : কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। ঘন্টা দুয়েক চলার পর, শোওয়ার সময় জেনারেটরটা ওঁরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেটুকু সময় জেনারেটর চলেছিল তাতেই সর্বনাশ হল। কার্বন মনোক্সাইড ভারী গ্যাস, যেটা তাঁবুর ফ্ল্যাপের ভেতর দিয়ে বের হতে পারেনি, ওখানেই জমা হয়েছিল।

প্রশ্ন : কার্বন মনোক্সাইড তো সরাসরি রক্তে মিশে যায়।

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, যন্ত্রণাও হয় না। ওঁরা ঘুমিয়েছিলেন, ভারী গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড নিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন।

প্রশ্ন : অ্যান্টার্কটিকায় ভারত কী প্রোগ্রাম নিয়েছে ?

সুদীপ্তা : আমরা ওখানে গ্লেসিয়ার নিয়ে পরীক্ষা করছি। জীববিজ্ঞানীরা বেশিরভাগ কাজ করছেন ক্রিল নিয়ে। ভারত এখন তার এলাকাতে 'রিজিওনাল ম্যাপিং' করছে। কুমেরুর ভূত্বকের নীচে কোথায় কয়লা, খনিজ তেল আছে খুঁজে দেখছে।

প্রশ্ন : কিছু পেয়েছেন ?

সুদীপ্তা : নবম অভিযান অবধি আমরা অ্যান্টার্কটিকাতে কিছুই খুঁজে পাইনি। অন্য কোনও দেশ কিছু পেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

প্রশ্ন : উল্কা পাননি ?

সুদীপ্তা : উল্কা খোঁজার জন্য আলাদা একটি 'মিটিওরাইট সার্চ প্রোগ্রাম' থাকে। ভারতের এই জাতীয় কোনও প্রোগ্রাম নেই। রিজিওনাল ম্যাপিং করতে-করতে উল্কার খোঁজ পেলে সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার।

বিরল প্রজাতির 'পেট্রেল'

প্রশ্ন : ভারত তা হলে এখনও কোনও উল্কা খুঁজে পায়নি ?

সুদীপ্তা : না, সবচেয়ে বেশি উল্কা খুঁজে পেয়েছে জাপান। ওদের 'মিটিওরাইট সার্চ প্রোগ্রাম' বেশ জোরদার।

প্রশ্ন : ১৯৯১ সালে অ্যান্টার্কটিকা চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তারপর অ্যান্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ কী ?

সুদীপ্তা : আমার মনে হয়, চুক্তিটা এখনও তিরিশ বছর থাকবে। কারও অভিযোগ থাকলে ১৯৯১ সালে সেটা সে জানাবে। চুক্তির অনুচ্ছেদে কিছু সংশোধন হতে পারে, কিন্তু চুক্তিটা থাকবে।

প্রশ্ন : অ্যান্টার্কটিকাতেও তো পরিবেশ-দূষণ বাড়ছে।

সুদীপ্তা : তার প্রথম কারণ, মানুষ বেড়েছে। অ্যান্টার্কটিকাতে যত বেশি ক্যাম্প হবে, তত বেশি দূষণ বাড়বে। নিয়ম অনুযায়ী অভিযানের সব জিনিসপত্র জাহাজে নিয়ে ফেরার কথা। এই নিয়ম ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কি না দেখার জন্য আন্তর্জাতিক একটা কমিটিও আছে। তবে, কেউই নিয়ম পুরোপুরি মানে না।

প্রশ্ন : অ্যান্টার্কটিকার বাতাসে ওজোন-স্তরে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে।

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, ১৯৮২-তে একটা আমেরিকান স্যাটেলাইট প্রথম ওই ফাটল লক্ষ করে। গত ৮ বছরে ওটা অনেকটা বেড়ে গেছে। ওজোন-স্তর নিজে ভেঙে গিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবীতে পৌঁছতে দেয় না।

প্রশ্ন : এই ফাটলের কারণ কী ?

সুদীপ্তা : হাইড্রো-ফ্লুরো কার্বনের পরিবেশ-দূষণ। সারা পৃথিবী ওই কার্বন ব্যবহার করছে। পরিবেশ-দূষণ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তার প্রমাণ কুমেরুর ওজোন-স্তরে ওই ফাটল। আর, অ্যান্টার্কটিকার কিছু হলে সর্বনাশ সারা পৃথিবীর।

প্রশ্ন : কেন ?

সুদীপ্তা : অ্যান্টার্কটিকার ওই বরফে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। আর মাত্র ১ মিটার বরফ বাড়লে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যাবে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বরফস্তর ১ মিটার কমলে সূর্যের আলো আসবে, পৃথিবী আরও উষ্ণ হবে।

প্রশ্ন : তা হলে বরফ-ঢাকা জনপ্রাণীহীন কুমেরু মহাদেশই এখন পৃথিবীর বাঁচার একমাত্র আশা ?

সুদীপ্তা : হ্যাঁ, ঠিক তাই।

অ্যান্টার্কটিকা-চুক্তি

সভ্য মানুষের লুব্ধ হাতের ছোঁয়ায় অ্যান্টার্কটিকা আজ বিপন্ন। খনিজ তেল আর ধাতুর খোঁজ সেখানে চলছে পুরোদমে। প্রতি বছর মারা হচ্ছে সিল, তিমি, ক্রিল আর অসংখ্য পেঙ্গুইন। ১৯৫৯-'৬০ সালে ধরা হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার মিঙ্ক, চল্লিশ হাজার স্পার্ম তিমি। দুর্লভতম নীল তিমিও মারা হয়েছে তিনটি। ১৯৬৪ সালে নরওয়ে মেরেছিল এগারোশো সিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই শুধুমাত্র ম্যাকোয়ারি দ্বীপে মারা হয়েছিল দেড় লক্ষ কিং-পেঙ্গুইন। এমনকী, এই পরিবেশ-সচেতনতা ও সংরক্ষণের যুগে একটি জাপানি ও একটি আর্জেন্টিনীয় ব্যবসায়িক সংস্থা যৌথভাবে বছরে ৪৮,০০০ ম্যাকালান পেঙ্গুইন শিকারের পরিকল্পনা নিয়েছে। উদ্দেশ্য, এদের চামড়া দিয়ে দস্তানা তৈরি করা।

অ্যান্টার্কটিকাকে বাঁচাতে ১৯৫৯ সালে গ্রেট ব্রিটেন, আর্জেন্টিনা, চিলি, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড, এই সাতটি দেশ সম্মিলিতভাবে এক চুক্তি সই করে। এর নাম 'অ্যান্টার্কটিকা-চুক্তি'। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশই বর্তমানে সই করেছে এই চুক্তিতে। ষোলোটি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট এই চুক্তির বলে অ্যান্টার্কটিকায় সবরকম আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ. এখানে কোনও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে না। এই মহাদেশে শান্তি ও ভারসাম্য বজায় রেখে সম্মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এই চুক্তি। আগামী বছর, ১৯৯১ সালে শেষ হবে এই চুক্তির মেয়াদ। তারপর এই মহাদেশের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ।

হামবোল্ট পাহাড়ে গবেষণারত জনৈক ভূতাত্ত্বিক

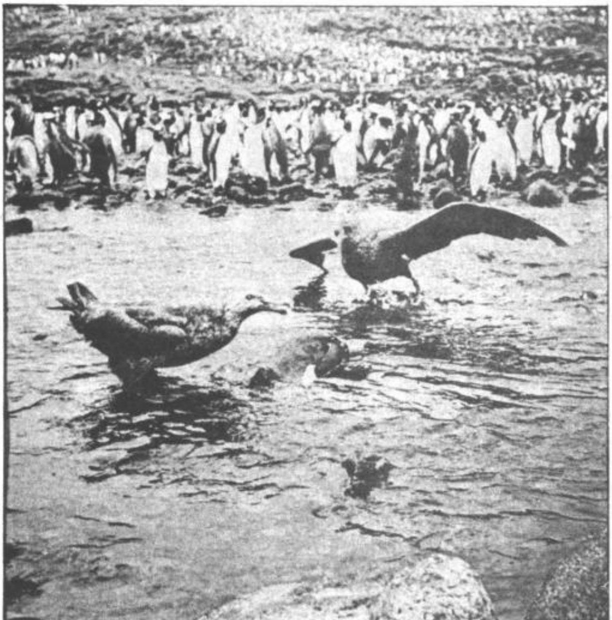

এক পেঙ্গুইনের মৃতদেহ নিয়ে ঝগড়া করছে দুই পেট্রেল

জমে ওঠে প্রাণের খেলা। মোট একশো একানব্বইটি প্রজাতির আণুবীক্ষণিক জীবের খোঁজ মিলেছে সেখানে, হ্রদের জলে বা সমুদ্রের ধারে তুষারমুক্ত মাটিতে। প্রোটোজোয়া থেকে আরম্ভ করে রটিফার, মাইট, কোপেপোডা, সবকিছু মিলিয়ে গড়ে উঠেছে এক অনন্য জীবজগৎ। ক্ষণিকের খেলাঘরেই এরা জন্মায়, সংসার পাতে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে বরফের তলায়। প্রতীক্ষা করে পরের বছর কখন আবার বরফ গলবে।

অ্যান্টার্কটিকাকে পাখির রাজ্য বললে খুব ভুল হবে না। কমপক্ষে দশ কোটি পাখির বাস এখানে। এদের মধ্যে কেউ থাকে সারা বছর, আবার কেউবা শুধু বাসা বাঁধার সময়টিতে হাজির হয়। নাম ধরে বলতে গেলে পেঙ্গুইন, পেট্রেল, স্কুয়া, গাল, টার্ন, করমোর্যান্ট, অ্যালবাট্রস, আর ফুলমারের বাস এই মহাদেশে। বলাই বাহুল্য, এদের মধ্যে পেঙ্গুইনকে বলা যেতে পারে অ্যান্টার্কটিকার প্রতীক-পাখি। অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ সীমানা ছাড়া এদের অ্যান্টার্কটিকার বাইরে আর কোথাও দেখা যায় না।

অ্যালবাট্রস, করমোর্যান্ট, গাল, টার্ন এবং পেঙ্গুইনের খাদ্য সামুদ্রিক মাছ, অক্টোপাসজাতীয় প্রাণী স্কুইড এবং চিংড়িজাতীয় ক্রিল। পেট্রেলকে বলা যেতে পারে অ্যান্টার্কটিকার শকুন। স্কুয়ার ধরনধারণ

অনেকটা বাজপাখির মতো। সুযোগ পেলেই এরা অন্য পাখির বাসা থেকে ডিম সরায়, ছানা মেরে ফেলে।
অ্যান্টার্কটিকার জীবজন্তুদের খাদ্যের প্রধান উৎস হল সামুদ্রিক ক্রিল। পাঁচ-ছয় সেন্টিমিটার লম্বা কুচো চিংড়ির মতো প্রাণীটির লাতিন নাম ইউফসিয়া সুপার্বা। গরমের মাসগুলিতে সমুদ্রে পনেরো থেকে কুড়ি মিটার পুরু কার্পেটের মতো একটি স্তর তৈরি করে এরা। এই ক্রিলের লোভেই ছুটে আসে বিভিন্ন জাতের মাছ, সিল আর তিমি। ১৯৮০ সালে এলিফ্যান্ট দ্বীপের কাছে অভূতপূর্ব ক্রিলের সমাগম হয়। বেশ কয়েক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা ক্রিল কার্পেটটি ছিল দুশো মিটার পুরু। দশ হাজার মেট্রিক টনের মতো ক্রিল ধরা হয় ওই অঞ্চলে, বাজারে যার দাম বেশ কয়েক কোটি টাকা।
দক্ষিণ গোলার্ধের সমুদ্রে একধরনের এককোষী বা বহুকোষী শ্যাওলা, যাকে পরিভাষায় বলা হয় ফাইটোপ্লাঙ্কটন, ভেসে থাকে ওপরের আলোকিত অঞ্চলে। ক্রিল এদের খেয়েই বেঁচে থাকে।
অক্টোপাসের নিকট আত্মীয় কিন্তু আটের বদলে দশটি পা-ওলা স্কুইডেরও খাদ্য ক্রিল। অ্যান্টার্কটিক সমুদ্রে নানা জাতের অসংখ্য স্কুইড চোখে পড়ে।

পাথুরে দ্বীপের বাসিন্দারা

সর্বক্ষণ অ্যান্টার্কটিকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া, মাঝে মাঝে যার গতি দাঁড়ায় ঘণ্টায় তিনশো কিলোমিটারের বেশি।....উপদ্বীপ অঞ্চল ছাড়া খুব কমদিনই তাপমাত্রা এখানে হিমাঙ্কের ওপরে ওঠে।

কুমেরু ক্যালেন্ডার

সময়	অভিযাত্রী	দেশ	ঘটনা
অগস্ট, ১৫৯২	জন ডেভিস	ইংল্যান্ড	ফকল্যান্ড দ্বীপ আবিষ্কার। পেঙ্গুইন মেরে লন্ডনে নিয়ে এলেন ডেভিস
জানুয়ারি, ১৭৭৩	জেমস কুক	ইংল্যান্ড	প্রথম 'কুমেরু বৃত্ত' অতিক্রম
ফেব্রুয়ারি, ১৮২১	জন ডেভিস	আমেরিকা	পৌঁছলেন অ্যান্টার্কটিকার মেইনল্যান্ডে
জানুয়ারি, ১৮৮০	জুল জ্যাম দারভিল	ফ্রান্স	'টেরা অ্যাডেলি' অঞ্চল ও অ্যাডেলি পেঙ্গুইন আবিষ্কার
জানুয়ারি, ১৮৪১	সার জেমস রস	ইংল্যান্ড	রস সমুদ্র, এরেবুস আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার
নভেম্বর, ১৯০২	রবার্ট স্কট	ইংল্যান্ড	স্কটের প্রথম অভিযান। খুঁজে পেলেন না দক্ষিণ মেরু
১৪ ডিসেম্বর,১৯১১	রোনাল্ড আমুন্ডসেন	নরওয়ে	দক্ষিণ মেরুতে উড়ল নরওয়ের জাতীয় পতাকা
নভেম্বর, ১৯২৮	হুবার্ট উইলকিন্স	আমেরিকা	অ্যান্টার্কটিকার আকাশে এই প্রথম উড়ল বিমান
জানুয়ারি, ১৯৫৮	সার এডমন্ড হিলারি	নিউজিল্যান্ড	হিলারি স্নো-ট্রাক্টরে অতিক্রম করলেন কুমেরু মহাদেশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৯			অ্যান্টার্কটিকা-চুক্তি
জানুয়ারি, ১৯৮২			অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে পা রাখলেন ভারতীয় অভিযাত্রীরা

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি

ক্রিল এবং স্কুইডের তুলনায় অ্যান্টার্কটিক সমুদ্রে মাছের প্রাচুর্য তেমন বেশি নয়। মোটামুটি দুশো প্রজাতির মাছ মেলে এখানে। অধিকাংশ মাছই ছোট আকারের, লম্বায় পঁচিশ-ত্রিশ সেন্টিমিটারের বেশি হয় না। এই অঞ্চলের অদ্ভুত একটি মাছ—অ্যান্টার্কটিক আইসফিশ (চিনোসেফালাস অ্যাসেরেটাস এবং চিনোসেফালাস বাউভেটেনসিস)। অন্য মাছের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড় আইসফিশের রক্ত বর্ণহীন, তাতে হিমোগ্লোবিন নেই। এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ভাবাই যায় না। মেরুদণ্ডী প্রাণীমাত্রেরই রক্তে লোহিত কণিকা থাকবে আর তার মধ্যে শ্বাসরঙ্গক হিসেবে হিমোগ্লোবিন থাকতেই হবে, এটা প্রাণিবিজ্ঞানীদের বহুকাল ধরে জানা। তাই এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁদের কাছে যখন এমন একটি অদ্ভুত মাছের খবর পৌঁছল, তখন তাঁরা প্রথমে খবরটিকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সে ভুল তাঁদের ভেঙে গেল। ১৯৫১ সালে প্রাণিবিজ্ঞানী স্টেইনার ওলসেন অ্যান্টার্কটিক সমুদ্র থেকে আইসফিশ নিয়ে ফিরলেন।

আইসফিশ, বিশেষ করে এই মাছটির রক্ত আজও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময় থেকে গেছে। এমন কিছু প্রোটিন ফ্যাক্টরের সন্ধান পাওয়া গেছে মাছটির রক্তরসে, যা রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। হিমাঙ্কের কাছাকাছি জলের তাপমাত্রা নেমে গেলেও এরা দিব্যি কর্মক্ষম থাকে। বিজ্ঞানীদের আশা, কিছুদিনের মধ্যেই আইসফিশের রক্তের রহস্যটি তাঁরা বুঝে ফেলবেন আর তঞ্চনরোধী পদার্থটির স্বরূপও নির্ণয় করতে পারবেন। করোনারি থ্রম্বসিস রোগের আসল কারণ হল হৃৎপিণ্ডের দেওয়ালে সূক্ষ্ম করোনারি রক্তনালীতে রক্তের তঞ্চন। আইসফিশের রক্তরসের তঞ্চনরোধী পদার্থ এই রোগের চিকিৎসায় সুফল দেবে।

অ্যান্টার্কটিক মহাসমুদ্রের বাসিন্দা দুটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম হল তিমি এবং সিল। মোট আটটি প্রজাতির তিমি এবং দশটি প্রজাতির ডলফিনের (প্রাণিবিজ্ঞানে দু' জাতের প্রাণীকেই 'সিটেসিয়া' বর্গে ফেলা হয়) বাস এখানে। তিমিদের মধ্যে একমাত্র স্পার্ম তিমি দাঁতাল আর অন্যান্য তিমির দাঁত নেই। পরিবর্তে এদের ওপরের চোয়াল থেকে চামড়ার তৈরি একসারি ছাঁকনি বা 'বেলিন প্লেট' ঝুলে থাকে। সমুদ্রের জল থেকে ক্রিল, স্কুইড এবং মাছ এরা বেলিনের সাহায্যেই ছেঁকে নেয়।

ডলফিনরা সকলেই দাঁতাল। এই অঞ্চলের ক'টি উল্লেখযোগ্য ডলফিন প্রজাতি হল কিলার হোয়েল, পাইলট হোয়েল, বটলনোজ হোয়েল, দক্ষিণের রাইটহোয়েল ডলফিন, আওয়ারগ্লাস ডলফিন, স্পেক্‌ট্যাকলড পরপয়েজ ইত্যাদি। নামে হোয়েল হলেও কিলার, পাইলট এবং বটলনোজরা আসলে ডলফিন। আয়তনে অন্যান্য ডলফিনের থেকে অনেক বড় বলে চলতি কথায় এদের হোয়েল বলা হয়। পরপয়েজদের আলাদা কোনও বাংলা নাম নেই, ডলফিনের মতো এদেরও শুশুক বলা হয়। দু' জাতের প্রাণীর মধ্যে তফাত খুব একটা নেই।

মোট ছ' জাতের সিল—ক্র্যাব ইটার, ওয়েডেল, লেপার্ড, রস, দক্ষিণের এলিফ্যান্ট এবং ফার সিলের বসবাস অ্যান্টার্কটিকার মহাসমুদ্রে। অবশ্য তিমি বা ডলফিনের মতো সিলরা সারাক্ষণ জলে কাটায় না, মাঝেমাঝেই উঠে আসে ডাঙায়।

বাবু পেঙ্গুইন

কালো কোট পরে, হেলেদুলে-চলা নাদুসনুদুস এক বাবু হল পেঙ্গুইন। পাখির রাজ্যে এই বাবুটি বেশ বেমানান, না পারে ঠিকমতো উড়তে, আবার না পারে ঠিকমতো দৌড়তে। দক্ষিণ গোলার্ধের তুষার-রাজ্য ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বিচিত্র এই পাখিটিকে দেখতে পাওয়া যায় না।

উড়তেই যদি না পারে, তা হলে এর ডানা আছে কেন? আসলে, হাঁটাহাঁটির সময়ে পেঙ্গুইন ডানা দিয়ে তার ভারসাম্য রক্ষা করে আর সাঁতার কাটার সময় ওই

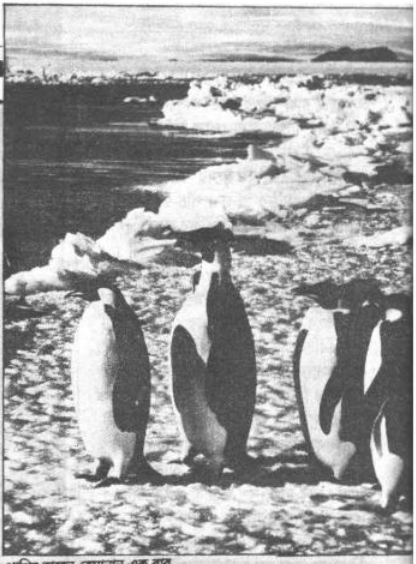

পাখির রাজ্যে বেমানান এক বাবু

ম্যাকমুর্ডো দ্বীপের খুনে তিমি

ডানা দিয়ে প্যাডেলের কাজ চালায়। সাঁতারু হিসেবে পেঙ্গুইন রীতিমত দক্ষ, ডুবুরি হিসেবেও কম যায় না। মাছ, স্কুইড আর ক্রিলের খোঁজে সাঁতরে চলে যায় বহুদূর!

অ্যান্টার্কটিকার ঠাণ্ডা জলস্রোতে সময় কাটাতে পেঙ্গুইন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। চামড়ার নীচে 'ব্লাবার' নামে পুরু চর্বির স্তর গরম রাখে গোটা শরীরকে আর ডানার মধ্যে বিশেষ ধরনের রক্তজালিকা 'রেটিয়া মিরাবিলিয়া'-এর সাহায্যে দরকারমতো তাপবিকিরণ এবং তাপসংরক্ষণের কাজ চালিয়ে নেয়।

স্ত্রী-পেঙ্গুইন সাধারণত বছরে একটি বা দুটি ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই চলে যায় সমুদ্রে, খেয়েদেয়ে চর্বি সঞ্চয় করে। পুরুষ-পেঙ্গুইন ডিমে 'তা' দিতে আরম্ভ করে। মাথার ওপর বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া, দিনের পর দিন পুরুষ-পেঙ্গুইন পিঠের দিকে ঘাড়-মুখ গুঁজে পায়ের ওপর ডিমটি রেখে বসে থাকে। দীর্ঘ সময়, দেড় বা দু' মাস ধরে চলে নিরম্বু এই উপবাসের পালা, ক্লান্ত পিতার শরীরের ওজন কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

একদিন সমুদ্রের দিক থেকে আচমকা ফিরে আসে স্ত্রী-পেঙ্গুইনের দল। এবার বাবা যায় সমুদ্রবিহারে, 'তা' দিতে বসে মায়েরা। শেষে একদিন বাবারাও ফিরে আসে। ততদিনে ডিম ফুটে নবজাতকের পৃথিবীর আলো দেখার সময় হয়ে এসেছে! পুরুষ-পেঙ্গুইন ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে পেঙ্গুইন-ছানা। এর পর একদিন পেঙ্গুইন-দম্পতি বাচ্চাদের নিয়ে বের হয়, বেড়াতে-বেড়াতে চলে আসে সমুদ্রের কাছে। উদ্দেশ্য বাচ্চাদের সাঁতার এবং শিকারে পটু করে তোলা।

পেঙ্গুইনের জাত-শত্রু দুটি। কিলার হোয়েল ও লেপার্ড সিল। স্কুয়ারাও অনেকসময় তক্কে-তক্কে থাকে, শিশু-পেঙ্গুইনকে একা পেলে মনের আনন্দে তাকে সাবাড় করে।

রকহপার, জেন্টু, ম্যাকারনি প্রভৃতি সতেরো জাতের পেঙ্গুইনের খোঁজ পাওয়া গেছে দক্ষিণ গোলার্ধে। সবচেয়ে বড় হল এম্পারার পেঙ্গুইন, এরা লম্বায় প্রায় একশো সেন্টিমিটার।

যেতে হবে দুর্গম সেই মহাদেশে

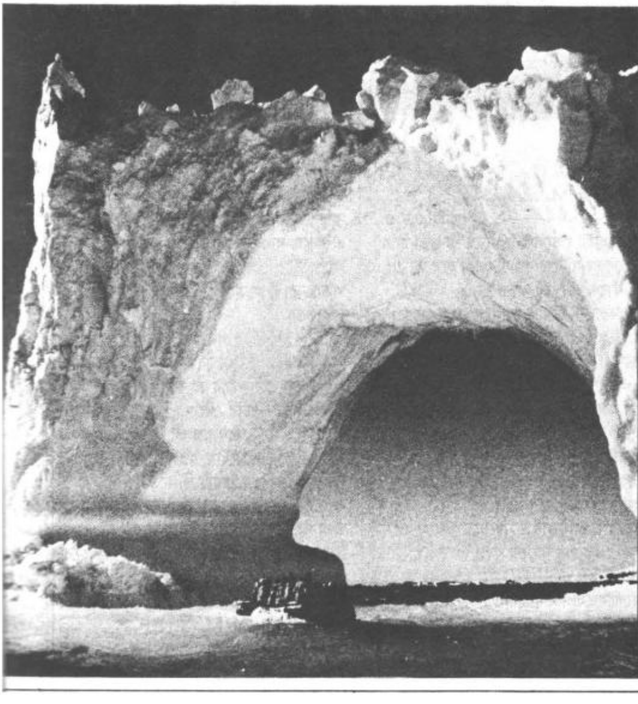

রোদ পোয়াচ্ছে ওয়েডেল সিল

ছ'টি জাতের মধ্যে প্রথম পাঁচটি জাতের দেখা মেলে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ধারেকাছে, ফারসিলরা ডেরা বাঁধে একটু দূরের দ্বীপগুলিতে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটার সময়ে তিমি এবং সিলের চামড়ার নীচে থাকা পুরু চর্বিস্তর বা 'ব্লাবার' এদের রক্ষা করে। সিলের দেহে আবার ঘন জলনিরোধক লোমের আবরণ থাকে। তা ছাড়াও এদের পাখনা বা প্যাডেলে থাকে অদ্ভুত এক রক্তজালিকা বা 'রেটি মিরাবিলিয়া'। এই রক্তজালিকার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলের সময়ে জলের সঙ্গে দেহের তাপবিনিময় চলে, বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা এবং দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে পার্থক্য কমে যায়। দরকারমতো রক্তজালিকার মধ্যে রক্তপ্রবাহ এরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। জল বেশি ঠাণ্ডা হলে জালিকার মধ্যে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয়, দেহতাপও বিকিরিত হয় কম। আবার গরমের দিনে জালিকার মধ্যে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়, দেহতাপ বেরিয়ে যায় সহজে। দেহের তাপমাত্রাও কমে যায়।

অ্যান্টার্কটিকার আকর্ষণ আজও ফুরিয়ে যায়নি, ভবিষ্যতেও ফুরোবে না। আর বহুযুগের ওপার থেকে ছিটকে আসা এই মহাদেশে কত না রহস্য রয়ে গেছে আজও। বিবর্তনের নিজস্ব পথে কয়েক কোটি বছরে প্রকৃতি, উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল মিলে এক স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করেছে এখানে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তা মেলে না কোনওমতেই। দুর্গম দূরত্বের জন্য এই মহাদেশ কিছুদিন আগেও লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল।

সহজে ফরট্রান

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কম্পিউটারের ভাষা ফরট্রান। কীভাবে চটপট এই ভাষা শেখা যায় তা জানিয়েছেন **অসীমরতন ঘোষ**

ফরট্রান ভাষা তৈরি করে আই· বি· এম কম্পানি, ১৯৫০ সালে। ফরমুলা আর ট্রানস্লেশন এই দুই শব্দের প্রথমটুকু নিয়ে ফরট্রান কথাটা তৈরি। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেএ ভাষা আজও দারুণ চলছে। এই কাজে আর কোনও ভাষাই ফরট্রানের মতো জনপ্রিয় নয়।

ফরট্রানের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুনগুলি এবং কীভাবে তাদের কাজে লাগিয়ে প্রোগ্রাম লেখা যায় তা নিয়েই এই আলোচনা।

ফরট্রান বর্ণমালা : বর্ণ : A থেকে Z ; সংখ্যা : ০ থেকে ৯ ; যতি চিহ্ন : · , ( ) ƀ ; গাণিতিক চিহ্ন : + - * / = 1

এই চিহ্নগুলি ব্যবহার করে ফরট্রানের শব্দ ও সূত্র তৈরি করা হয়।

ফরট্রান সংখ্যা : পূর্ণ ও বাস্তব—মানে দশমিকবিহীন ও দশমিকযুক্ত সংখ্যা দু'রকমই ফরট্রানে ব্যবহৃত হয়। 10, -5, + 221—এ-সবই পূর্ণ সংখ্যার উদাহরণ। 5.52, -3.33 বা + 23.123—এগুলো সবই বাস্তব সংখ্যা।

ফরট্রান চলরাশি : কম্পিউটার প্রোগ্রামে সাধারণত কোনও হিসেব করতে গেলে সত্যিকারের সংখ্যা না লিখে সেখানে লেখা হয় চলরাশির নাম। তা দিয়ে তৈরি করা হয় সূত্র। একটি বর্ণ (যেমন I, A বা X) বা কয়েকটি বর্ণ পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরি শব্দ (যেমন NUMBER, SPEED বা TIME) চলরাশির ভূমিকা পালন করে। কোন চলরাশি পূর্ণ, কোনটিই বা বাস্তব তা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলে দেওয়া যায়। ফরট্রান-8-এ কোনও চলরাশি I, J, K, L, M বা N দিয়ে শুরু হলে সেই চলরাশিটিকে পূর্ণ বলে ধরা হয়, অন্য সব ক্ষেত্রে এটি বাস্তব বলে গণ্য হয়।

ফরট্রানে গণনা : সংখ্যা, চলরাশি ও গাণিতিক চিহ্ন কাজে লাগিয়ে তৈরি করা যায় নানারকম সূত্র। জটিলতা এড়াতে বন্ধনীর দরকার পড়ে। অজানা একটি চলরাশির পরে = চিহ্ন লিখে সূত্রের বাকি অংশ এর ডান দিকে লেখা হয়।

যেমন Y = M * x + C

আবার $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$ —সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলের একটিতে উষ্ণতা জানা থাকলে অন্যটিতে কত উষ্ণতা হবে তা এই সূত্র কাজে লাগিয়ে জানা যায়।

ফারেনহাইটে উষ্ণতা জানা থাকলে এবং সেন্টিগ্রেডে তার তুল্য উষ্ণতা জানতে চাইলে লেখো :

C = 5 * (F-32)/9

আর ফারেনহাইটে জানতে চাইলে লেখো : F = 9 * C/5 + 32

অ্যাসাইনমেন্ট বিবৃতিতে চলরাশি বাঁ দিকে থাকে তারপর = চিহ্ন, ডান দিকে থাকে সংখ্যা। যেমন X = 10

চিহ্নের অগ্রাধিকার : সবচেয়ে প্রথমে বন্ধনীর কাজ। এর পর ঘাতের কাজ (* *)। তারপর গুণ ও ভাগের কাজ (* /)। সবশেষে যোগ ও বিয়োগের কাজ (+ -)। কম্পিউটার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কাজগুলি করতে চেষ্টা করে।

ইনপুট বিবৃতি : প্রোগ্রামে ব্যবহৃত চলরাশিগুলি প্রোগ্রামের শুরুতে কম্পিউটারকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এ-কাজে ব্যবহৃত হয় READ বিবৃতি। কম্পিউটার কোথা থেকে, কী আকারে তথ্য পড়বে তা ঠিক করে দেওয়া থাকে এই বিবৃতিতে।

READ শব্দটির পর বন্ধনীর মধ্যে 5, 6 বা * এই জাতীয় সংখ্যা লিখতে হয়। এটি কোন যন্ত্র থেকে তথ্য পাবে তা বলা থাকে। 5 বললে কার্ড রিডার থেকে 6 বললে টার্মিনাল থেকে * লিখে কোন যন্ত্র তা না বলা যেতে পারে। বন্ধনীর মধ্যেই এর পর কমা দিয়ে ফরম্যাট বিবৃতির ক্রমটি লিখতে হয়। ফরম্যাট বিবৃতি মারফত ঠিক হয় কী আকারে তথ্য পড়া হবে। কোনও সংখ্যাকে 5—সংখ্যার পূর্ণ সংখ্যা বোঝাতে লিখতে হবে FORMAT (I 5)। দশমিকের পর তিন ঘর এবং আগে দুই ঘরের সংখ্যার জন্য লিখতে হবে FORMAT (F 6.3)। একটা উদাহরণ :

READ (6, 20) SPEED, TIME
20 FORMAT (F 5.2, I 2)

আউটপুট বিবৃতি : কোনও ফলপ্রকাশ করতে হলে কম্পিউটার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার সময়ই জেনে গেছে এমন চলরাশির নাম WRITE শব্দটির পর লিখতে হয়। READ বিবৃতির মতো এখানেও WRITE শব্দটির পর বন্ধনীর মধ্যে যন্ত্রের সঙ্কেত, যে সংখ্যাটি প্রকাশ করা হবে তার আকার, এদের মধ্যে কতটা ফাঁক থাকবে তা লিখতে হয়। একটি উদাহরণ :

WRITE (6, 70) LENGTH, SPEED, TIME
70 FORMAT (5X, F 5.1, 5X, F 5.2, 5X, I 2)

ফরট্রান নিয়ন্ত্রক বিবৃতি : কম্পিউটারকে নিজের নিয়মে কাজ করতে দিলে প্রোগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর সে পড়ে যায়, তা বোঝে এবং সেইভাবে কাজ করে। কিন্তু সবসময় একে এইভাবে কাজ করতে দেওয়া যায় না। তাই দরকার হয় এমন কিছু বিবৃতির, যাদের দিয়ে কম্পিউটারের কাজের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক বিবৃতি সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হল :

কম্পিউটার ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক কাজেই এখন কম্পিউটার দারুণভাবে কাজে লাগছে। চোখের পাওয়ার মাপাতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার হচ্ছে। শুধু এটুকুই নয়, দেহের ভেতরের জটিলতা বুঝতেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষের তুলনায় যন্ত্রের ভুল কম হয়, কারণ তার কোনও আবেগ নেই, উত্তেজনা নেই, স্মৃতিভ্রমের সম্ভাবনা নেই। এই কারণেই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত নানা যন্ত্রপাতি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন যুগ এনেছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ফরট্রান আবর্ত (ডু লুপ) : কোনও প্রোগ্রামের কোনও অংশের কাজ বারবার করতে হলে এই গঠনটি ব্যবহৃত হয়। DO লুপ দিয়ে যতবার যতটা দরকার তা পুনরাবৃত্তি করা যায়।

এর গঠন—DO শব্দটি লেখার পর যত অবধি পুনরাবৃত্তি করতে হবে সেই বিবৃতির ক্রমটি লিখতে হবে, এর পর একটি চলরাশি লিখে তারপর = চিহ্ন এবং তারপর চলরাশির প্রাথমিক ও অন্তিম মান লিখতে হয় :

DO 40 I=1,100
....
....
40 CONTINUE

আগের উদাহরণটিকে DO-লুপ ব্যবহার করে এইভাবে লেখা যায় :

DIMENSION SIX (40)
SUM = 0
DO 10 I = 1, 40
SUM = SUM + SIX (I)
10 CONTINUE
WRITE (*, *) SUM
STOP
END

কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ DO বিবৃতিটিতে আসা মাত্র সে জেনে যায় কোন বিবৃতি অবধি আবর্তন করতে হবে। আবর্তন কতবার এবং প্রত্যেক আবর্তনের সময় চলরাশির মান কী হবে তাও সে জেনে যায় চলরাশির প্রাথমিক ও অন্তিম মান থেকে। চলরাশির মান অন্তিমে পৌঁছলে ডু-লুপের আবর্তন শেষ হয়। আবর্ত থেকে বেরিয়ে কম্পিউটার পরের বিবৃতিগুলির কাজ পর পর করতে থাকে।

সাবপ্রোগ্রাম : ছোট-ছোট কিছু প্রোগ্রাম অনেক সময় মূল প্রোগ্রামে সরাসরি ব্যবহার করা হয়। এদের উদ্দেশ্যই হল, প্রায়ই দরকার হয় এমন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের অংশ মূল প্রেগ্রামে আর লেখার দরকার হয় না। সাবপ্রোগ্রাম দু'রকম : ফাংশন সাবপ্রোগ্রাম এবং সাবরুটিন সাবপ্রোগ্রাম। (ক্রমশ)

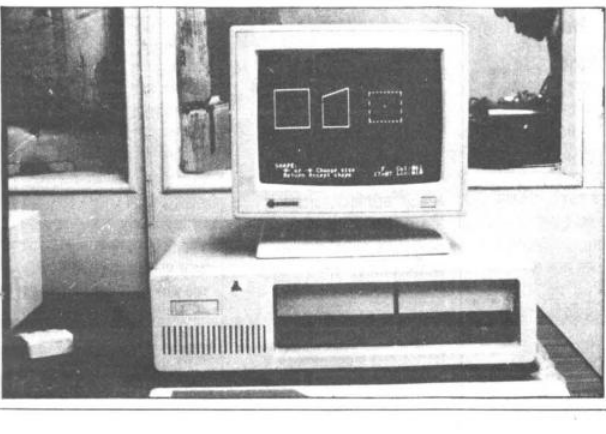

কুমেরু

দুঃসাহসী অভিযাত্রী স্কট

কুমেরুর তুষারঝড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট

অভিযানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ক্যাপ্টেন স্কট। অজানাকে জানার দুর্বার ইচ্ছা ছিল তাঁর।

কুমেরু মহাদেশের অন্যতম দুঃসাহসী অভিযাত্রী রবার্ট ফ্যালকন স্কট (১৮৬৮-১৯১২) জন্মসূত্রে ইংল্যান্ডের ডেভনপোর্ট শহরের বাসিন্দা। তিন পুরুষের নাবিক পরিবারের ছেলে রবার্ট স্কট ফেয়ারহ্যাম শহরে রাজকীয় নৌবাহিনীর স্টাবিংটন হাউস স্কুলে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তেরো বছর বয়স হতে-না-হতেই তিনি শিক্ষার্থী-জাহাজ 'ব্রিটানিয়া'-তে কাজ শুরু করেন। ১৮৮৩ থেকে '৮৭, এই কয়েক বছরের মধ্যেই স্কট নৌবাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী হিসেবে 'বোদিচিয়া', 'লায়ন', 'মোনার্ক', 'রোভার' এই চারটি জাহাজে কাজ করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি উন্নীত হলেন লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার পদে। ১৮৯৯ সালে 'এইচ এম এস ম্যাজেস্টিক' জাহাজে কাজ করার সময় স্কটের সঙ্গে একজনের পরিচয় হল। তিনি রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির তদানীন্তন সচিব সার ক্লিমেন্টস মার্কহ্যাম। এই মার্কহ্যামই পরবর্তীকালে 'জাতীয় অ্যান্টার্কটিক অভিযান'-এর নেতৃপদের জন্য স্কটের নাম সুপারিশ করেছিলেন। অভিযানের জন্য 'ডিসকভারি' জাহাজের ভার নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্কট উন্নীত হলেন কমান্ডার পদে। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো। সার জেম্‌স ক্লার্ক রস ১৮৪১ সালে অ্যান্টার্কটিকার এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯০১ সালের অগস্ট মাসে জাহাজ ছাড়ল, নোঙর ফেলা হল রস দ্বীপে পৌঁছে। ১৯০২ থেকে ১৯০৪ সাল অবধি পরবর্তী দুটি গ্রীষ্মকালে স্কট স্লেজগাড়ি নিয়ে তুষারাবৃত কুমেরু মহাদেশের বুকে বহুদূর অভিযান চালালেন। এরকমই এক অভিযানের সময় ডঃ উইলসন ও ই এইচ শ্যাকলটনের সঙ্গে স্কট পৌঁছলেন ৮২°১৬'৩৩" দক্ষিণ অক্ষাংশে। তারিখটা ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০২। এর আগে এতটা দক্ষিণে কেউ পৌঁছতে পারেননি। এই অভিযানের সময় স্কট শুধুমাত্র দক্ষ নেতা হিসেবেই নিজের পরিচয় রাখেননি, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে ফিরে স্কট আবার নৌবহরে তাঁর চাকরিতে যোগ দিলেন, উন্নীত হলেন ক্যাপ্টেন পদে। 'ভিক্টোরিয়া', 'এসেক্স', 'বুলওয়ার্ক'—তিনটি জাহাজেই কাজ করতে করতে রাখলেন নিজের কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ১৯০৮ সালে বিয়ে করলেন ক্যাথলিন ব্রুসকে। পরের বছর ভাইস-অ্যাডমিরালের সহকারী হিসেবে কাজ করতে-করতেই স্কট আবার সাড়া দিলেন দক্ষিণ মেরুর ডাকে। ঘোষণা করলেন, অ্যান্টার্কটিকায় তিনি আবার চালাবেন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। পৌঁছবেন দক্ষিণ মেরুতে। এবারের অভিযানে স্কটের 'টেরা নোভা' জাহাজ বন্দর ছাড়ল ১৯১০ সালের জুন মাসে। নিউজিল্যান্ডে পৌঁছনোর পর তিনি শুনলেন নরওয়ের রোনাল্ড আমুন্ডসেনও এবার দক্ষিণ মেরু বিজয়ের জন্য তোড়জোড় করছেন। তা সত্ত্বেও স্কট তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন না, কেপ ইভান্সে পৌঁছেই স্থাপন করলেন অভিযানের শীতকালীন শিবির।

১৯১১ সালের ১ নভেম্বর স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর জন্য অভিযান শুরু করলেন। মোটর-চালিত যান খারাপ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও তিনি দমলেন না। কুকুর নিয়ে, টাট্টু ঘোড়া নিয়ে শেষ অবধি পৌঁছলেন বিয়ার্ডমোর হিমবাহের পাদদেশে।

১৯১২ সালের ৪ জানুয়ারি। লেফটেন্যান্ট ইভান্সের নেতৃত্বে বেস-ক্যাম্প স্থাপন করে রইল একদল। ডঃ উইলসন, ক্যাপ্টেন ওট্‌স এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে অজস্র পরিশ্রমের শেষে স্কট পৌঁছলেন দক্ষিণ মেরুতে। সেদিন ১৮ জানুয়ারি। পৌঁছে দেখলেন সেখানে উড়ছে নরওয়ের জাতীয় পতাকা। আগেই পৌঁছে গেছেন আমুন্ডসেন।

ফিরে আসাটা ছিল সাঙ্ঘাতিক। ৮০০ মাইলেরও বেশি পথ। সারাক্ষণ শুধু খারাপ আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। রসদ প্রায় নেই, জ্বালানিও ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ইভান্স। ওট্‌সের সমস্ত পা জুড়ে গভীর তুষারক্ষত, তিনি চাইলেন না অন্যদের বোঝা হতে। ১৭ মার্চ রাত্রে তুষারঝড়ের সময় তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এক সপ্তাহ পর আর-এক তুষারঝড়ের কবলে পড়লেন স্কট। বেস-ক্যাম্প তখন মাত্র ১১ মাইল দূরে। আট মাস পর এক অনুসন্ধানী দল আবিষ্কার করেছিল স্কট ও তাঁর দুই সঙ্গীর মৃতদেহ। ডায়রি, ব্যক্তিগত কাগজপত্র, সংগৃহীত ভূতাত্ত্বিক নমুনা সব তখনও পড়ে ছিল তাঁদের দেহের পাশে।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) সার গ্যারি সোবার্সের পর কোন ক্রিকেটার সম্প্রতি নাইটহুড পেয়েছেন ? **রিনা দে**, চেতলা।
(২) টিভি সিরিয়াল 'দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান'-এ হায়দর আলির ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন ? **যিশু ভট্টাচার্য**, কোচবিহার।
(৩) টেনিস ছাড়া অন্য কোন খেলায় 'গ্র্যান্ড স্লাম' কথাটি যুক্ত ? **শেখ আবদুর রব**, বর্ধমান।
(৪) কানাডার রাজধানীর নাম কী ? **সৈকত হাজরা**, হাওড়া।
(৫) সত্যজিৎ রায় ও রাজ কাপুর—এই দুই পরিচালকের ছবিতেই অভিনয় করেছেন, এমন দুই অভিনেত্রীর নাম কী ? **কিংশুক গুপ্ত**, ঝাড়গ্রাম।
(৬) আয়ন (ion) শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ? **অরূপ দাস**, করিমগঞ্জ।
(৭) 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা কে ? **সঞ্জীব পাঁজা ও রাজীব হাজরা**, বর্ধমান।
(৮) 'অরণ্যদেব' চরিত্রটি কে সৃষ্টি করেছেন ? **সাগর সাহা**, বেলডাঙা।
(৯) কোন ভারতীয় ভাষার বর্ণমালা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয় ? **সব্যসাচী দে**, বর্ধমান।
(১০) কোন টেনিস-খেলোয়াড়ের ডাকনাম 'দ্য সার্জন' ? **সুদীপ্ত সেন**, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল।
(১১) পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট পাখি কোনটি ? **উর্মিতা মাইতি**, ঝাড়গ্রাম।
(১২) 'টু মাই নেটিভ ল্যান্ড' নামক কবিতাটি কে লিখেছিলেন ? **ভাস্কর রায়চৌধুরি**, মাইথন।
(১৩) রেক্স হ্যারিসন অভিনীত একমাত্র ভারতীয় ছবি কোনটি ? **সৈয়দ ফারহানা**, বীরভূম।
(১৪) ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম গোলদাতা কে ? **সমীর ঘোষ**, বর্ধমান।
(১৫) কোন কবিকে 'কবিশেখর' বলা হয় ? **অনীককুমার সাঁই**, পাল্লা রোড।
(১৬) এবারে লেনিন শান্তি পুরস্কার কে পেয়েছেন ? **সৌম্যেশ মণ্ডল**, ভোগপুর।
(১৭) 'মাদার' উপন্যাসের রচয়িতা কে ? **মিতা দে**, কলকাতা-২৭।
(১৮) 'গন উইথ দ্য উইন্ড' উপন্যাসটি কে লিখেছিলেন ? **সম্যক নন্দী**, হাওড়া।
(১৯) কোন নাট্যকার নাটকে তৃতীয় চরিত্র চালু করেছিলেন ? **শুভজিৎ রায়চৌধুরী**, সিরিটি, কলকাতা-৪১
(২০) 'ভিনি, ভিডি, ভিসি'—এই বিখ্যাত উক্তিটি কার ? **সত্যজিৎ রায়চৌধুরী**, সিরিটি, কলকাতা-৪১।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ইউরেনাস।
(২) দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা।
(৩) মিনিটে ৭২ বার।
(৪) আনন্দমোহন বসু।
(৫) সেইম (Sejm)
(৬) সানহোজে।
(৭) ইতালির ফ্রাঙ্কো বারেসি।
(৮) চিমা ওকেরি। মোট ১৪৬টি গোল দিয়েছেন।
(৯) নটিলাস।
(১০) ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ।
(১১) হংকং।
(১২) হ্যানয়।
(১৩) ১৯৭৫ সালের ৪ অগস্ট।
(১৪) ১৯৭৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।
(১৫) ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি।
(১৬) নামিবিয়া।
(১৭) আস্তালনা রিজে।
(১৮) কোয়াচা।
(১৯) প্রত্যেকের জার্সির নম্বর ১০।
(২০) প্রণবানন্দজি।
(২১) ১। অন্ন ২। ভাপ্পা ৩। মহানাম ৪। ভন্দ ৫। অশ্যাপী।
(২২) দাম।
(২৩) ইতালির লুসিও বোসকার্ডিন।
(২৪) ৭ ডিসেম্বর।

মারাদোনা

পেলে

চিমা ওকেরি

আনন্দমোহন বসু

বিষয় : গোঁফ-দাড়ি

প্রশ্ন

(১) ইউরোপের কোন রাজা প্রজাদের দাড়ির ওপর কর বসিয়েছিলেন ?

(২) সম্রাট আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যদের দাড়ি কামাতে বাধ্য করেছিলেন কেন ?

(৩) ডব্লিউ জি গ্রেস সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত দাড়িওয়ালা ক্রিকেটার। তাঁর পর কোন দাড়িওয়ালা ইংরেজ ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়াতে টেস্ট-সফরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

(৪) কোন উইম্বলডন-চ্যাম্পিয়ান টুর্নামেন্ট চলার সময় গোঁফ-দাড়ি কামান না ?

(৫) দাড়ি দেখে ভয় পাওয়ার মানসিক অসুস্থতাকে এক কথায় কী বলা হয় ?

(৬) চার্লি চ্যাপলিন ও গ্রুশো মার্স, এই দুই বিখ্যাত কমেডিয়ানের বিখ্যাত গোঁফ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ?

(৭) জর্জ বার্নার্ড শ' দাড়ি রাখতেন কেন ?

(৮) ইউরোপের এক বিখ্যাত চিত্রকরের নামে এক ধরনের দাড়ির নাম রাখা হয়েছে। তাকে কী বলা হয় ?

(৯) 'গোঁফ-পেয়ালা' কী ?

(১০) কোন ধরনের দাড়িকে বলা হয় 'মাটন-চপ' ?

(১১) কোন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিককে বলা হয় 'দাড়িওয়ালা পণ্ডিতমশাই ?'

(১২) কোন রাষ্ট্রনেতাকে 'এল বার্বুদো' বা 'দাড়িওয়ালা' নামে ডাকা হয় ?

(১৩) রোমান সম্রাট প্রথম ফ্রেডরিকের পদবি কী ছিল ?

(ক)

প্রশ্ন

(ক) ২৩৮ সেন্টিমিটার লম্বা গোঁফধারী এই ব্যক্তির নাম কী ?

(খ) বিখ্যাত চিত্রকর। কে ইনি ?

(গ) তিরিশের দশকে রবিনহুডের ভূমিকায় অভিনয় করে ইনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁর নাম কী ?

(ঘ) বিখ্যাত এই কমেডিয়ানের নাম বলো।

(খ)

(গ)

(ঘ)

ছবির পরিচয় : (ক) কর্ণ ভেল। (খ) সালভাদর দালি। (গ) এরল ফ্লিন। (ঘ) গ্রুশো মার্কস।

উত্তর : (১) রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট। (২) যুদ্ধের সময় কাছাকাছি দাঁড়ানো শত্রুসৈন্য দাড়ি টেনে দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে কাছে নিয়ে এসে ছুরিকাহত করতে পারে। আর একটি কারণ হল, আলেকজান্ডারের নিজের দাড়ি খুব একটা ভাল ছিল না। সুতরাং সম্রাট কেন তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের দাড়ি রাখার সুযোগ দেবেন ? (৩) মাইক ব্রিয়ারলি। (৪) বিয়র্ন বর্গ। (৫) পোগনোফোবিয়া। (৬) দুটোই নকল গোঁফ। (৭) ছেলেবেলায় শ' মৃদু জলবসন্তে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুখে বসন্তের দাগ ঢেকে রাখার জন্যই তিনি দাড়ি রাখতেন। (৮) ভ্যান ডাইক দাড়ি। পরিষ্কার, ছুঁচলো দাড়িকে ওই নামে ডাকা হয়। (৯) গোঁফ রাখা যখন বিলাসিতা ছিল, সে সময় এই ধরনের বিশেষ পেয়ালা পানপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। পেয়ালার ওপরে অর্ধেক ঢাকনা থাকত, ফলে পানীয় গ্রহণের সময় গোঁফে সেটি লেগে যেত না। (১০) গাল ভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি যখন কুচো মাংসের মতো বলে বোধ হয়। (১১) সক্রেটিস। তাঁর ধারণা ছিল দাড়ি জ্ঞানের প্রতীক। (১২) ফিদেল কাস্ত্রো। (১৩) বার্বারোসা বা লাল দাড়ি। (১৪) সকালবেলায় দাড়ি কামানোর পর বিকেলবেলা গালে যে আবছা ছায়া পড়ে। (১৫) নীল দাড়ি। (১৬) কিং জিলেট। (১৭) এক ধরনের বিশেষ শোনপাপড়ি। (১৮) সালভাদর দালি। (১৯) সার ড্রেক কাদিজ বন্দরে নোঙর ফেলেছিলেন ও সেখানে দাঁড়ানো স্পেনের জাহাজগুলিকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। (২০) সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' কবিতায় শ্যামবাবুদের গয়লা। (২১) গ্রিকরা কোঁকড়ানো দাড়ি রাখতেন, রোমানরা দাড়ি ছাঁটতেন।

(১৪) 'বিকেল পাঁচটার ছায়া' কাকে বলা হয় ?

(১৫) রূপকথার চরিত্র শেভালিয়র রাওলের ডাকনাম কী ছিল ?

(১৬) সেফটি রেজর কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

(১৭) কোন জিনিসকে প্রচলিত ভাষায় 'বুড়ির চুল' বলা হয় ?

(১৮) কোন বিখ্যাত চিত্রকর তাঁর মোম-বাঁধানো গোঁফজোড়াকে বলতেন 'ব্যক্তিগত রেডার' ?

(১৯) ইংরেজ নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক সার ফ্রান্সিস ড্রেক 'স্পেনের সম্রাটের দাড়িতে ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন।' এই কথার অর্থ কী ?

(২০) 'নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা' গোঁফ কে রেখেছিলেন ?

(২১) প্রাচীন গ্রিক ও প্রাচীন রোমানদের দাড়ির মধ্যে পার্থক্য কী ছিল ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

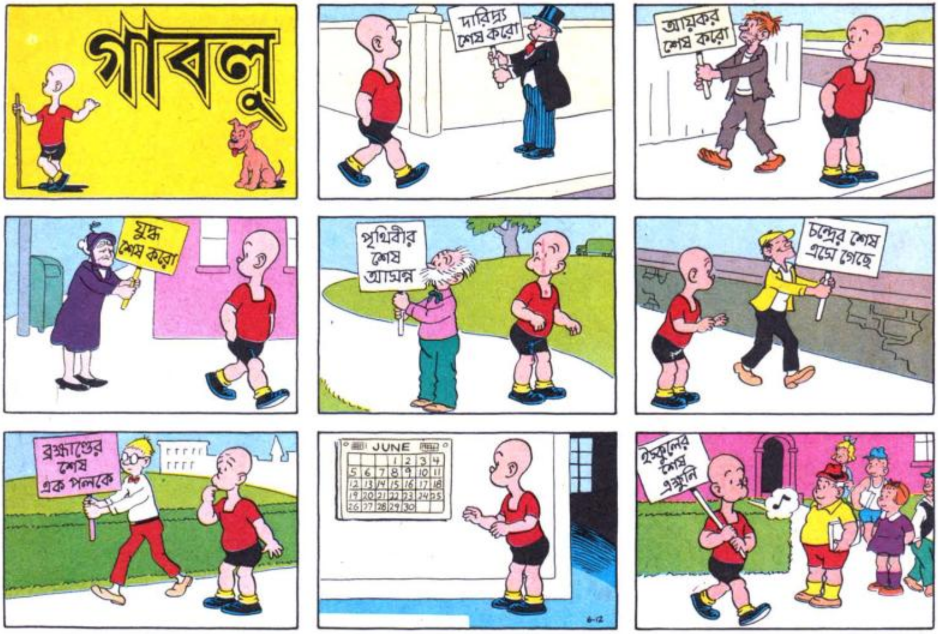

গাবলু
দারিদ্র্য শেষ করো
আয়কর শেষ করো
যুদ্ধ শেষ করো
পৃথিবীর শেষ আসন্ন
চন্দ্রের শেষ এসে গেছে
ব্রহ্মাণ্ডের শেষ এক পলকে
JUNE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
6-12
ইস্কুলের শেষ এক্ষুনি

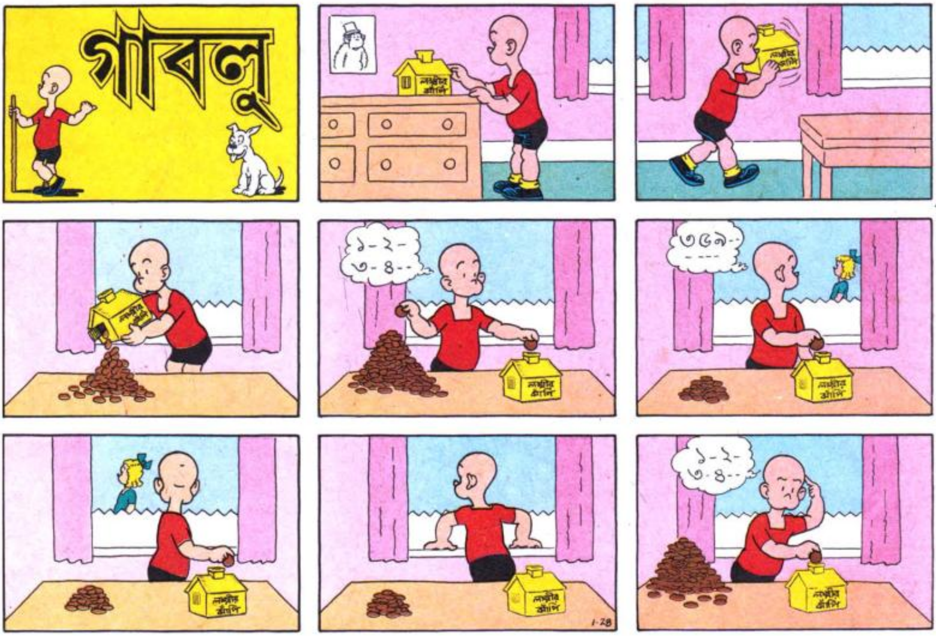

গাবলু
লক্ষ্মীর ঝাঁপি
১-২-৩-৪--
৩৬৯--
১-২-৩-৪--
1-28

মালাম্মার প্রতিজ্ঞা

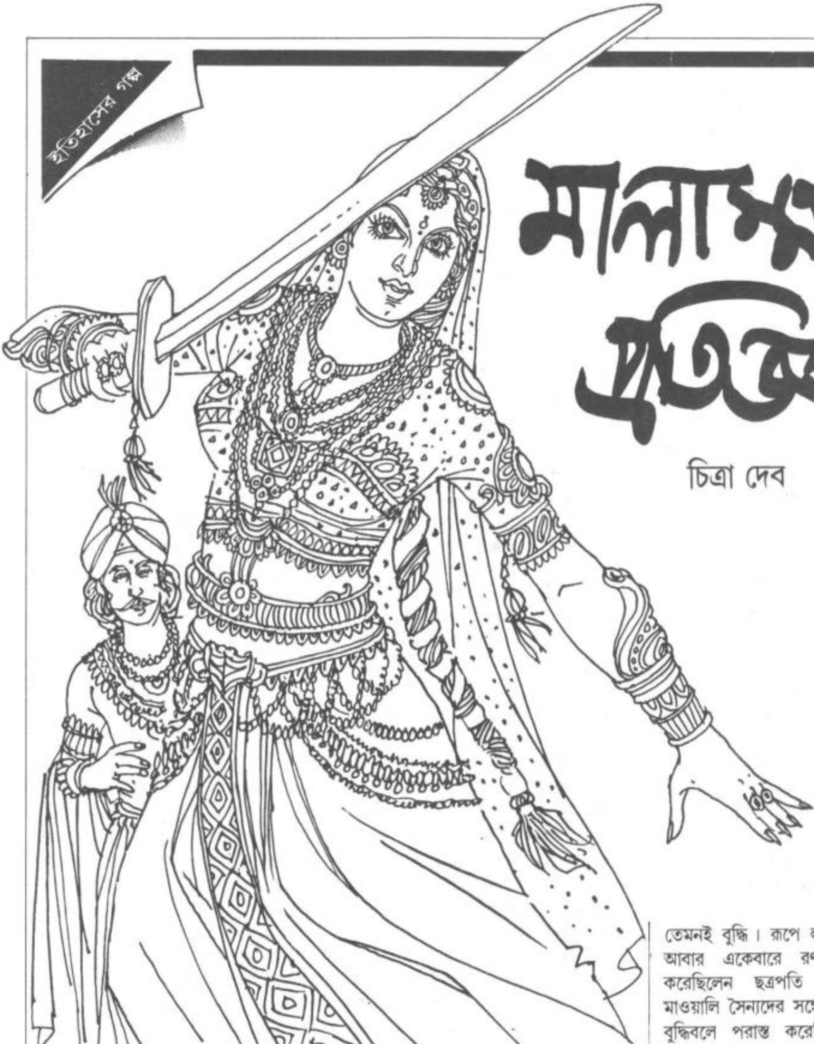

চিত্রা দেব

আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই যুদ্ধ করে পুরুষেরা। মেয়েদের যুদ্ধে যাওয়ার কথাও যে শোনা যায় না তা নয়। তবে সংখ্যায় খুব কম। যেমন জোয়ান অব আর্ক, রাজিয়া সুলতানা কিংবা রানি লক্ষ্মীবাঈ। আজ তোমাদের বীরাঙ্গনা মালাম্মার গল্প শোনাই। এক আশ্চর্য মেয়ে মালাম্মা। যেমন সাহস তেমনই বুদ্ধি। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আবার একেবারে রণচণ্ডী। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজির বিখ্যাত মাওয়ালি সৈন্যদের সঙ্গে। শুধু সৈন্য কেন, বুদ্ধিবলে পরাস্ত করেছিলেন শিবাজিকে। ভাবছ, কে এই মাল্লামা ? কী এমন কাণ্ড ঘটল যে, নিয়ম-নীতি বর্জন করে তিনি শিবাজির মতো বীরের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসলেন !

মালাম্মা ছিলেন বেলাভাদি নামে ছোট্ট এক রাজ্যের রানি। তিনশো ষাটখানি ছোট-ছোট গ্রাম নিয়ে বেলাভাদি উষর মহারাষ্ট্রের বুকে যেন একখানি মরূদ্যান ! ধান, গম, জোয়ার, আখ ছাড়াও সেখানে ছিল অনেক ফলের বাগান। পল্লব বংশের মধুলিঙ্গ নায়ক ছিলেন সোয়াদির রাজা। তাঁর রানির নাম বীরাম্মা। মাল্লামা এঁদেরই মেয়ে।

১৬৬১ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর দাদার নাম ছিল সদাশিব। ছোটবেলা থেকেই মালাম্মার অসামান্য বুদ্ধি দেখে তাঁর বাবা ঠিক করলেন, মেয়েকে ছেলের মতোই লেখাপড়া, অসিবিদ্যা সবই শেখাবেন। তা ছাড়া মহারাষ্ট্রের মেয়েরা একটু যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে ভালবাসত। পূর্বভারতে মেয়েরা তখন ব্যস্ত থাকত পুতুলখেলায়। তার ওপর মালাম্মার ছিল যেমন জেদ তেমনই সাহস। তাই পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি দাদার সঙ্গে শিখলেন কন্নড়, মরাঠি, উর্দু আর সংস্কৃত ভাষা। উর্দু না বলে ফারসি বলাই ভাল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ফারসি ছিল রাজভাষা। দশ বছরের মধ্যেই তাঁরা দুই ভাইবোন পাঠশালায় যেতে শুরু করলেন। বারো বছর বয়সে দেখা গেল মালাম্মা শুধু লেখাপড়াতেই ভাল নন, কবিতাও লিখতে শিখে গেছেন। কিন্তু সেকালে শিক্ষা শুধু লেখাপড়া শেখার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হত না। সবাইকে, বিশেষ করে প্রত্যেক ছেলেকেই, যুদ্ধ শিখতে হত। অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধের কলাকৌশল সবই মালাম্মা এত ভালভাবে শিখলেন, বলার কথা নয়। যুদ্ধ করতে তিনি ভালবাসতেন, তাঁর কৌশল দেখে তাঁর গুরুমশাই রঘুবীর সিংহও অবাক হয়ে যেতেন। মালাম্মা যাঁর কাছে লেখাপড়া শিখতেন তাঁর নাম শঙ্কর ভাট দীক্ষিত। তিনি ছিলেন সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের পণ্ডিত।

বেশ চলছিল। হঠাৎ বিপত্তি। রাজবাড়িতে এক সন্ন্যাসী এলেন। তিনি আবার ভবিষ্যৎ বক্তা। রাজা-রানি তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, আপনি বলুন আমাদের মালাম্মার ভবিষ্যৎ কেমন দেখছেন?"

ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন না, রাজার ছেলে রাজা হবে কিন্তু আদরের মেয়েটার কেমন ঘর-বর জুটবে, তা তো জানা নেই। সন্ন্যাসীঠাকুর অনেক আঁকজোক কাটলেন, তারপর বললেন, "এমনি তো ভালই দেখছি, তবে..."

"কী বলছেন বাবাঠাকুর?" বীরাম্মা জিজ্ঞেস করেন। মায়ের বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে।

"তোমাদের মেয়ের ষোলো বছর বয়সে একটা মারাত্মক ফাঁড়া আছে। বুনো জন্তুর আক্রমণে তার মৃত্যুযোগ রয়েছে। কোনওভাবে যদি সে ফাঁড়া কেটে যায়, তা হলে সে বিখ্যাত হবে।"

সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন। বাবা-মা'র মুখে অন্নজল ঘুচে গেল, চোখের ঘুম চলে গেল। তখনকার দিনে তো সর্বত্রই বনজঙ্গল, বুনো পশুর আনাগোনা। শেষে কোনও বিপদ ঘটবে কি না কে বলতে পারে? মালাম্মাই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। বললেন, "আমি, সবচেয়ে বেশি বাঘ মেরেছে যে রাজা, তাকেই বিয়ে করব। তোমরা স্বয়ংবর সভা ডাকো।"

রাজা-প্রজা সবাই খুশি। হ্যাঁ, রাজকন্যার মতো কথা বটে! রাজকন্যার ষোলো বছর বয়স হওয়ার আগেই খবর গেল সব রাজদরবারে। সোয়াদির রাজকন্যার স্বয়ংবর হবে, রাজারা আপন-আপন বাঘ শিকারের হিসেব নিয়ে হাজির হবেন। এই হিসেবেরও একটা নিয়ম ছিল, নিজের বয়স অনুযায়ী কে ক'টা বাঘ মেরেছেন তার পরিসংখ্যান চাই। অর্থাৎ আশি বছরের বৃদ্ধ রাজা যদি পঞ্চাশটা বাঘ মেরে থাকেন, তাঁর চেয়ে বেশি নম্বর পাবেন পঞ্চাশ বছরের রাজা যদি চল্লিশটা বাঘ মেরে থাকেন। অঙ্কটা হবে বয়সের সঙ্গে বাঘের সংখ্যার গড় হিসেবে।

বহু রাজা এলেন। কালাডির রাজা, কুর্গের রাজকুমার, মহীশূরের রাজকুমার, আনেগোন্দির রাজা, বুন্দেলখণ্ডের রাজা, শিবাজির দুই ছেলে, কাশ্মিরের রাজকুমার, বর্ধমানের রাজা, জয়পুরের রাজা, উদয়পুরের রানা—কারও‌ই তালিকায় বাঘের সংখ্যা কম নেই। নিজের বয়সের তুলনায় কারও দুটো-একটা কম, কারও বা চার-পাঁচটা—এর কমের শিকারিরা বোধ হয় প্রতিযোগিতায় আসেননি, এলেও প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেছেন। পরমাসুন্দরী রাজকন্যা মালাম্মা দাঁড়িয়ে আছেন মালা হাতে। আগে যাঁদের নাম বললাম, তাঁরাই প্রধান প্রতিযোগী। এঁদের মধ্যে উদয়পুরের রানার বাঘের সংখ্যা তাঁর বয়সের তুলনায় মাত্র একটি কম। সবাই ভাবল বুঝি তিনিই বরমালা পাবেন। কিন্তু না, জিতলেন শেষপর্যন্ত বেলাভাদির রাজা ঈশ্বরপ্রভু। তরুণ রাজা, বয়স মাত্র কুড়ি। হলে কী হবে? এরই মধ্যে তিনি বাঘ মেরেছেন একুশটি—যত বয়স তার চেয়ে একটা বেশি। সারা বাড়ি ভরে গেছে বাঘের ছালে। মালাম্মা হাসিমুখে তাঁর গলাতেই বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। সব্বাই খুশি হল। মালাম্মা বরের সঙ্গে এলেন শ্বশুরবাড়ি বেলাভাদিতে।

দু-এক বছর সুখে কেটে গেল। ঈশ্বরপ্রভু অতবড় শিকারি হলে কী হবে, বেশ শান্ত এবং ভক্ত রাজা ছিলেন। যতদূর মনে হয়, বড় যোদ্ধাও ছিলেন না। তীর্থধর্ম করতে বড্ড ভালবাসতেন। ১৬৭৭ সালে তাঁরা দু'জনে

গোকর্ণ থেকে তীর্থ করে ফিরছেন, সে-সময় বনের মধ্যে একটা সুন্দর সরোবর দেখে ওঁরা সেখানে বসেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারলেন। রাজার একটু ঘুম পেয়ে যেতে শুয়ে পড়লেন সেখানেই। লোকলশকর রইল দূরে। হঠাৎ বনের মধ্যে একজোড়া বাঘ এসে হাজির। একটা ছুটল ঘোড়ার পেছনে, অপরটা মালাম্মার দিকে। মালাম্মা ভয় পেলেন না। স্বামীকে ডাকলেনও না, তলোয়ার খুলে এককোপে কাটলেন একটাকে, অন্যটাও ছুটে আসায় তাকে মারলেন ছোরা দিয়ে। সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা সফল হল। ঈশ্বরপ্রভু ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন শোরগোল শুনেই। তিনি রানির বাঘ-মারা দেখে অভিভূত হয়ে বললেন, "এই বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারলাম না। নিজের বিপদকে তুমি নিজেই কাটালে।"

রাজ্যময় ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। মালাম্মা নিজেই গড়ে তুললেন এক নারীবাহিনী। তাদের যুদ্ধ করা শেখাতে লাগলেন। ১৬৭৮ সালে রানির কোল আলো করে একটি

ফুটফুটে ছেলে এল, দেখেশুনে তার নাম রাখা হল নাগভূষণ।

যে-সময়কার কথা বলছি, সে-সময় সমস্ত দক্ষিণ ভারত জুড়ে রয়েছেন শিবাজি। তিনি নিজেকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করলেন ১৬৭৪ সালে, রামগড়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসলেন। মুঘল সম্রাট, বিজাপুরের সুলতান, গোয়ার পর্তুগিজরা কিংবা জনজিরার আবিসিনীয়রা কেউ ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেননি। তবে হিন্দু রাজারা তাঁকে মনে-মনে ভালবাসতেন। বেলাভাদির রাজা ঈশ্বরপ্রভুও স্থির করলেন তিনি শিবাজিকে সবদিক থেকে সাহায্য করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হঠাৎ শিবাজির সৈন্যরা তাঁর একটা গ্রামে ঢুকে ফল-টল পেড়ে, সমস্ত জন্তুজানোয়ার ধরে নিয়ে চলে গেল। শিবাজির কড়া নির্দেশ ছিল তাঁর সৈন্যরা কেউ বিনা দোষে মানুষের গায়ে হাত দেবে না। সেজন্যই বোধ হয় এই সৈন্যরা দুর্যোধনের মতো রাজ্যের গোরু চুরি করে নিয়ে গেল। গরিব প্রজারা এসে কেঁদে পড়ল রাজার কাছে। ঈশ্বরপ্রভু কথাবার্তা চালাতে শুরু করলেন সৈন্যাধ্যক্ষ সিদ্ধগন্ধ পাতিলের সঙ্গে।

ওদিকে আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল। গোরু চুরির খবর পেয়ে রেগেমেগে মালাম্মা বেরিয়ে পড়লেন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে। দু' হাজার নারী-সৈনিকের পেছনে রইল তিন হাজার পুরুষ-সৈনিক, নারীদের পোশাক পরে। তাঁরা শিবাজির সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে প্রথমটায় খুব মজা মনে হলেও শেষে ঘাবড়ে গেলেন মরাঠি সৈন্যরা এবং শেষকালে তাঁদের সন্ধি করতে হল মালাম্মার সঙ্গে। সেনাপতি যখন দেখলেন তাঁর পক্ষের দু'শোজন আহত হয়েছে, তার মধ্যে দশ-বারোজনের অবস্থা মারাত্মক, অপরপক্ষে মারা গেছে মোটে তিনজন আর সামান্য আহত হয়েছে জনা-চল্লিশ সৈন্য, তখন তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হলেন মালাম্মার সঙ্গে। সব পশু তো ফেরত দিলেনই, সঙ্গে দিলেন আরও চারশোটি বলদ।

শিবাজি যখন এসব শুনলেন, তখন ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি সেনাপতিদের বললেন, "তোমরা এখনই যাও। বেলাভাদি দুর্গ অবরোধ করে রেখে দাও। ওখানকার রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তবে রাজপরিবারের কাউকে মারবে না। অকারণ রক্তপাত আমার পছন্দ নয়।"

ঈশ্বরপ্রভু দুর্গে বন্দী হলেন। মালাম্মা অবশ্য দুর্গে ছিলেন না কিংবা আগেই দুর্গ ছেড়ে পালাতে পেরেছিলেন। মরাঠার বর্গি সৈন্যরা বসে রইল। দুর্গে যাওয়া-আসার উপায় নেই, খাবার পাঠাবার উপায় নেই। যে ক'দিনের শস্য আছে তাতে কী হবে? ভাবনায় ভেঙে পড়ে ঈশ্বরপ্রভু চারদিকে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানালেন। প্রথমে সবাই ভয় পেল, ছত্রপতির বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস ক'জনের আছে? তবু এগিয়ে এলেন হুলির মহারাজা। কিন্তু তাঁর সাহায্য আসার আগেই অধৈর্য হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হলেন ঈশ্বরপ্রভু। মালাম্মাও বসে ছিলেন না, সৈন্যসামন্ত জড়ো করছিলেন, তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর। এবং এবারও যুদ্ধে জয় হল তাঁর। রক্তরাঙা খোলা তলোয়ার হাতে তিনি দুর্গে এসে দেখলেন, তাঁর স্বামীর তখন শেষ অবস্থা।

"মালাম্মা," ঈশ্বরপ্রভু তাঁর রানির হাতটি ধরে বললেন, "তুমি কথা দাও, শিবাজি মহারাজাকে তুমি একবার হারাবে। কথা দাও, তা হলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।"

মালাম্মা কথা দিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমি তাঁকে নিশ্চয় হারাব। যতদিন না পারি ততদিন আমি বিশ্রাম নেব না।" যদিও মালাম্মা ভাল করেই জানতেন শিবাজিকে হারানো যায় না, তবু প্রতিজ্ঞা করলেন মুমূর্ষু স্বামীর মুখ চেয়ে। ঈশ্বরপ্রভু মারা গেলেন। কিন্তু মালাম্মা কী করবেন? তাঁর চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল।

শেষে তিনি ঠিক করলেন শিবাজিকে হারাতে হবে, বুদ্ধি দিয়ে ছলনা করে। শিবাজি নিজেও তো অনেক সময় তাই করেন। মালাম্মা একজন গুপ্তচরকে যোগীর বেশে পাঠালেন শিবাজির কাছে। শিবাজি পরম ভক্ত, কাজেই তাঁকে বলা হল একটি বিশেষ মন্দিরে লোকোদম্বার পুজো করতে। আসলে শিবাজি ছিলেন দেবী ভবানীর ভক্ত। তিনি যখন সামান্য ক'জন দেহরক্ষী নিয়ে দেবীদর্শনে গেলেন, তখনই তিনি বন্দী হলেন মালাম্মার হাতে। মালাম্মা খবর পেয়ে একদিন আগে থেকেই দু'শোজন নারী-সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে বসে ছিলেন মন্দিরের চারপাশে। শিবাজি প্রণাম করে উঠে দেখেন সাক্ষাৎ জগদম্বার মতো এক দেবী। পদ্মফুলের পাপড়ির মতো বিশাল চোখে আগুন জ্বলছে, হাতে খোলা তলোয়ার। রানি বললেন, "ছত্রপতি, আপনি এখন বন্দী।"

যুদ্ধ অবশ্য হল না, কারণ সে-সময় যে শান্তির জন্য কথাবার্তা চলছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্যরা সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। শিবাজি তখন সেনাপতিকে বললেন, "আপনি মালাম্মাকে সসম্মানে পালকি করে আমার শিবিরে নিয়ে আসুন।"

শিবাজি ছিলেন সত্যিকারের বীর এবং মহৎ। তিনি শুনেছিলেন মালাম্মার প্রতিজ্ঞা ও তাকে সফল করার চেষ্টার কথা। শত্রু হলেও মালাম্মার যুদ্ধ ও বীরত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাই তাঁর শিবিরে মালাম্মা যখন এলেন, তখন তিনি তাঁকে বসতে দিলেন নিজের সিংহাসনে। হাতজোড় করে পরাজিতের মতো দাঁড়ালেন সামনে। সত্যিই তো, মালাম্মার বুদ্ধির কাছে তিনি পরাজিত, বন্দী হয়েছিলেন তাঁর হাতে। তখন মালাম্মা তাঁকে হত্যা করতেও পারতেন। মালাম্মার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল। সত্যি-সত্যি তো শিবাজির সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ ছিল না। শিবাজির মহত্ত্বে তা মিটে গেল। অনুগত প্রজার মতোই দামি উপহার দিয়ে শিবাজি মালাম্মাকে পৌঁছে দিলেন তাঁর নিজের রাজ্যে। বেলাভাদির রানির সঙ্গে শিবাজির আর কোনওদিন যুদ্ধ হয়নি। তাঁর ছেলেদের সঙ্গেও নয়।

ছবি : অনুপ রায়

রহস্য + রোমাঞ্চ + বিজ্ঞান

অ্যাডভেঞ্চার + খেলা +

কমিক্‌স্‌ + কল্পকাহিনী =

কিশোর সাহিত্যের সেরা পসরা সাজিয়ে এবার তোমাদের কাছে আসছে

আনন্দমেলা ১৩৯৭

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

সুবৃহৎ শঙ্কু-কাহিনী

স্বর্ণপর্ণী
সত্যজিৎ রায়

উপন্যাস

ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন
বিমল কর

উল্কা-রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চক্রপুরের চক্করে
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ফেরারি
মতি নন্দী

সোনাঝরা গল্পের ইনকা
শৈলেন ঘোষ

পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

কুয়াশা
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়গল্প

বাজা তোরা, রাজা যায়
বুদ্ধদেব গুহ

গুপ্তধনের গুপ্তকথা
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারাধন
দুলেন্দ্র ভৌমিক

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, শিবশঙ্কর মিত্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, হিমানীশ গোস্বামী, অরবিন্দ গুহ, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাশার, শেখর বসু, সমরজিৎ কর, আনন্দ বাগচী, সিদ্ধার্থ ঘোষ ও শিবতোষ ঘোষ।

বিশেষ আকর্ষণ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গল্প— শিব ও নুটু শিকদার,
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী— প্রবাল দ্বীপের রহস্য

ছড়া ও কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, সুনীল বসু, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন ভাদুড়ী, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সরল দে, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী ও প্রভাকর মাঝি।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

সুজন দাশগুপ্ত,
অনীশ দেব,
চঞ্চল পাল,
পার্থসারথি চক্রবর্তী।

অভিযান ও ভ্রমণ

ধ্রুব মজুমদার,
সুদেব রায়চৌধুরী

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

খেলাধুলো

রূপক সাহা,
সুভাষ ভৌমিক,
তানাজি সেনগুপ্ত।
খেলোয়াড়দের রঙিন ছবি

কমিক্স

ভুতুড়ে বাহিনী,
বীর তীরন্দাজ

দাম ৪৮ টাকা

CLARION C-ABAM-4

ফুলকুঁড়ি

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

কোচবিহার শহরের শেষমাথায় পুরনো আমলের নোনা-ধরা পাঁচিলের ভগ্নাংশে বিশাল বটগাছ উপরমুখী চাড়া দিয়ে উঠেছে। অথচ আজও সে গাছ মূল বাড়ির মাথা ছুঁতে পারেনি। ছোঁব-ছোঁব করছে। আসলে গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে আকারে-আয়তনেই বেড়েছে, মাথায় উঁচু হতে পারেনি।

কারণ হয়তো প্রথম-প্রথম প্রতাপরাজ নারায়ণের নাতিপুতিরা বিদেশ-বিভুঁই থেকে হঠাৎ-হঠাৎ এদিকে ছুটে আসত। তখন তোড়জোড় পড়ে যেত বাড়ি মেরামতির। লোকজন লেগে পড়ত দু-চারদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বাড়িটা বাসযোগ্য করে তুলতে। দু-পাঁচদিন রোশনাই জ্বলত, হুটোপাটি, হই-হুল্লোড়, সাড়াশব্দে সারা চত্বর জেগে উঠত। আনন্দ আর খুশবুর বান বইত। পুরনো আমলের চেনাজানা তাদের

জানাশুনো অতিথি-অভ্যাগতরা অকারণ এসে জুটত। ভাব জমাত। শত হলেও জমিদার বাড়ির প্রাচীন ঘরানা ও রক্তের গরিমা এদের টেনে রাখত।

এখন সেদিন নেই। হালফিলে ও-বাড়ি অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের আড্ডাখানা। ও-পথে আজ আর কেউ বড় একটা পা বাড়ায় না। কখনও-কখনও কোনও পথিক ওই খিড়কি-সড়কে এসে পড়লে বোঝা যায় এরা এমুখে সবে ঢুকেছে। এখানকার হালচাল এদের গোচরে নেই। ও-বাড়ির পথ-এলাকা আজকাল 'গম্বুজ-দালানবাড়ি' নামে লোকের মুখে-মুখে ফেরে। আশেপাশে বিস্তর আগাছার ঝোপঝাড়। ছায়া-ছায়া পরিবেশে পাখির কাকলি, ইঁদুর-চামচিকের দৌরাত্ম্য, সাদা খরগোশের ছোটাছুটি, নেড়ি কুকুরের ডাক, বিড়ালের ম্যাঁও ও খাঁ-খাঁ দুপুরে কাকের অনবরত কা-কা কেমন গা-ছমছম হাওয়া বয়ে আনে। আর দুপুর রাতে সহসা হাজা-মজা পুকুরপাড়ে ডাহুক ডেকে ওঠে। কিন্তু চারপাশের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে চাঁদনিরাতের মায়ামাখা আলোর সে এক শিউরে-ওঠা মায়াবী বৃত্ত-ঘেরা হয়ে থাকে। এ যেন কোনও অদেখা জাদুকরী বুড়ির কারসাজি, যেন তার কাঠির ছোঁয়ায় সব এলিয়ে আছে নিথর-নিঝুম। একটু-আধটু নড়াচড়াতেই সব মিলিয়ে যাবে, মুছে যাবে কালের গর্ভে, অতীত স্পন্দনে।

কিন্তু গম্বুজ-দালানবাড়ি নিয়ে গাঁয়ের মানুষজনদের মুখে যত জল্পনা-কল্পনাই থাক, সে দালানে ভয়-ভীতির কিছু নেই। এখন জনমুখের রটনায় কেউই আর ও-পথমুখো হয় না। নইলে দেখতে পেত সেখানে দিব্যি সংসার গেড়ে বসেছে হিরাবালা তার পান্নাকে বুকে জড়িয়ে। এ-গাঁয়ে হিরা বরাবরই ছিল এমন নয়। হিরা যে কোথা থেকে এল তাও ওরা জানে না। কিন্তু হামেশা ফুটফুটে দিব্য-দীপ্তির আভামাখা পান্নাকে হিরার কোলে হাসিমুখে দেখা যায়। রোজকার হাটে-বাজারে ভিড়ের মাঝে কেউ যদিও কারও মুখপানে চাইবার সুযোগ বড় একটা পায় না, সবাই যে-যার বেচাকেনা নিয়েই মেতে থাকে, কিন্তু সুষেণ ব্যাপারি দু-একদিন থমকে চেয়ে দেখেছে—রূপসী এক মহিলা আবরু-ঘেরা পোশাক সওদা করছে। কোল আঁকড়ে আছে বছর দুয়েকের শিশু। রূপের ছটায়, মধুমাখা হাসির তোড়ে যশোদা-দুলালকেও হার মানায়। বুঝিবা মানব সমাজের হাটে এক চাঁদমুখী দেবশিশু এসে ভিড়েছে। সুষেণ আরও দেখেছে কঙ্কণবতী কন্যার ওড়নার প্রান্তমুখ ধরে আছে এক শ্বেত-পাথরের সাদা কুকুর। কুকুরটা পোষা মালুম হয়, ফিরতি পথে ওর মুখে ঝোলা ঝুলতে দেখে। কিন্তু কথা কয়ে আলাপ জমাবার মতো সাহস সুষেণের ছিল না, কেননা মহিলার আচার-আচরণে নিষেধের গাম্ভীর্য বড়ই কড়া।

গম্বুজ-চূড়া দূর থেকে দেখা যায় বলেই সকলের কাছে বাড়িটার পরিচয় এই নামে ঘোরে। সত্যি বলতে কি, ও-বাড়ির প্রাচীন নাম অন্য ছিল। যেদিন থেকে বাড়িটা তার ঐতিহ্য হারিয়েছে সেদিন থেকে লোকেরা বাড়িটার নামও ভুলতে বসেছে। ও-বাড়ির ইঁদারা-পাড়ে মরা আমগাছের গুঁড়ির পাশে টিনে-ছাওয়া দোচালাতে ঘর বেঁধেছে হিরা, পান্নাকে বুকে নিয়ে। গোড়াতে এক থুত্থুড়ে বুড়ি অহল্যা ও-ঘরেই শুয়ে-বসে থাকত। কখনও-কখনও তাকে একমাথা সাদা চুল ছড়িয়ে পাশের পড়ে থাকা বাগানে শাক-পাতা

কবিতা

জানলা খোলা

শ্যামলকান্তি দাশ

ঝিকমিকিয়ে উঠছে হাওয়া
চাঁদের গুঁড়ো লেগে,
পদ্মপাতায় তারায় বোনা
আকাশ ওঠে জেগে,
কাঁসাই নদী আগের মতো
যাচ্ছে না আর রেগে।

বনকুসুমের মুলুক ছেড়ে
বেরোয় ভোঁদড়ছানা,
এত ফুলের ফোটার কারণ
যাচ্ছে না ঠিক জানা,
পুকুরজলে আঁকছে ছবি
হাঁসবলাকার ডানা।

সবার রঙে রঙ মেশাতে
জোছনা ওঠে সেজে,
এমনভাবে ঘরভোলানোর
ডাক পাঠাল কে যে,
পাগলা ভোলার গলাতে তাই
গান উঠেছে বেজে।

তাকিয়ে দ্যাখো মনপবনের
জানলা খোলা ওই,
মেঘের কুচোকাচারা সব
তোমরা এখন কই ?
গুছিয়ে রাখো বিজ্‌লিখাতা,
বাদলকালো বই।

ছবি : দেবাশিস দেব

তুলতে দেখা যেত। ঘোষালদের গোশালার গোরু চরাতে গিয়ে মদনা কতদিন দেখেছে পুকুর-দুয়ারের ভাঙা পাল্লার ধারে অশোক ফুলগাছের নীচে বুড়িমা জল-কলমি তুলে-তুলে জড়ো করছে। তার দিকে চোখ পড়তেই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মুখে সরে পড়েছে।

এখন আর সে-বুড়ি বেঁচে নেই। আছে এক থুবড়ো লোক। পাকা-চুলের দশাসই এ-বুড়োকে ইতিহাসের পাতার জ্যান্ত সাক্ষী বলে ভুল হয়। যেন কতশত ঝড়-বাদল এ-দেহ বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আজ শূন্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। বলাবলি হয়, ও-বুড়ো নাকি জমিদার পরিবারের বংশধর। কিন্তু শরিকি মামলায় হেরে গিয়ে এই জনমানব-ছাড়া ধু-ধু মাঠে ঠাঁই নিয়েছে। সাদা-বুড়ির সঙ্গে ও-বুড়োর সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের হলেও পথের কালবেলায় ওই বুড়িই ছিল তার শেষ ভরসা। আজ সে না থাকাতে বুড়োর জীবন না-বলা যন্ত্রণায় জরজর হয়ে জিয়ানো আছে কোনওমতে। পরপারের ঘন্টাধ্বনি শোনার জন্য স্টেশনে পৌঁছেও ট্রেনে চাপতে পারছে না, হাতে ধরা আছে টিকিট। আর এই যে হিরাসুন্দরীর কথা বললাম, এ যে কোথা থেকে এসেছে তাও ভাল করে জানা যায় না। শোনা যায় এদের এই জমিদারির সঙ্গে তারও একরকম জড়িয়ে পড়ার কথা-কাহিনী। গল্পগাথা যাই থাক, সাগরপাড়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ে যে অনুপম সৌন্দর্য তৈরি করে সে জোছনাও তার রূপ-জলুসে মুখ লুকোয়, তবু সে একা। বড়ই একা। তার সারাক্ষণের সঙ্গী পান্না। পান্নার সবসময়ের বন্ধু মোতি। আর সকলের দয়ার পাত্র ওই অসহায় বৃদ্ধ। এ যেন ভিখিরির ঘরে হাভাতের আমন্ত্রণ।

সরকারি খোরপোশে বুড়োর ভরণ টেনেটুনে চললেও পোষণ কোনওমতেই কুলোয় না। হিরাকে ছুটতে হয় শহর-মুখে, নানা সন্ধানে। হিরাসুন্দরী আর সুকণ্ঠী। তাই-শখের নাটুয়া-দলে কাজটা চেষ্টা করে জুটিয়ে নেয়। হিরা কোনও পরীক্ষায় পাশ না দিলেও লেখাপড়া জানে। তা ছাড়া জমিদার নিধিনারায়ণের কনিষ্ঠ বংশধর কুমারনারায়ণের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল। কাজেই শিক্ষা তার আছে। সে অল্পস্বল্প গানের সুর ভাঁজে আনমনা হয়ে। কিন্তু সচরাচর গলা ছেড়ে গান ধরে না। কুমারনারায়ণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তো বটেই, নাটক-অভিনয়ের দিকে তাঁর অনুরাগ ছিল অতিমাত্রায়। তিনি খুব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। দরাজ গলায় ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ বড় বেশি

খাপ খেত। নেশা ছিল কবিতা-পাঠ ও ছড়া কাটা। দেশ-বিদেশের কবিতার বইয়ের দুর্লভ সংস্করণ সংগ্রহ করে আলমারি-দেরাজ ভর্তি করেছিলেন। চমৎকার বাঁশিও বাজাতে পারতেন। সবাই বলত কুমারবাহাদুরের দম অফুরন্ত, উদাত্ত গলায় 'শাজাহান' পাঠ ধরলে পাশের নাটমন্দিরের নাচের তাল কেটে যেত।

মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে ছোটবাহাদুরও বিদ্যা দু'হাতে ঢেলে তৃপ্ত হতে চেয়েছিলেন। একদিন ছোটবাহাদুরের সঙ্গে হিরার তুমুল তর্কাতর্কি। তারপর সে চলে এল এই তল্লাটের দোরগোড়ায়। শেষে ডেরা বাঁধল ওই সাদা-বুড়ির স্নেহনীড়ে। আর সকলে বলে হিরা ওদেরই কেউ। কিন্তু যতদূর জানা যায় সে এ-গাঁয়ে এসেছিল তার মায়ের আপন ভাইয়ের ছেলের খোঁজে। আজ থেকে সতেরো বছর পেছনে অনাথ হিরা কিশোরীকালে সেই মামার বাড়িতে ঘর খুঁজতে এসে পথে নামে, এখনও চলছে স্থায়ী আস্তানার সুলুকসন্ধান। যাহোক, ভাইয়ের খবর না মিললেও সাদা-বুড়ি হিসেবের সম্পর্ক না মেনে ওকে বুকে টেনে নিতে দ্বিধা করেনি। আর তা ছাড়া এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে লতায়-পাতায় জড়াজড়ি হয়ে আছে সাদা-বুড়ি, হিরাবালাসহ আরও কতজনে।

এ-সবই তো পুরনো কথা-কাহিনী। এ-সবে আমাদের তেমন টান নেই। আমরা অবরে-সবরে ও-বাড়ির মানুষকে মাঠেঘাটে দেখে থাকলে মুখ তুলে চাই—ভাবি, কী জানি বাবা, ওরা সত্যি মানুষ তো! নাকি অপদেবতা-টেবতা কিছু। ওদের মানে হিরার চলাফেরায়, চেহারা-ছবিতে এমন বুদ্ধিমত্তার ছাপ, যা গ্রামবাংলার ঘরে বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু আমাদের ঝোঁক না থাকলেও ও-বাড়ির পুরাকালীন ঘটনার হাতছানি বুড়োকে ও হিরাকে ভাবায়। আর তখন উভয়ের বুকেই মোচড় টের পাওয়া যায়। বুড়ো সেকেলে-দিনে ফিরে গেলে—লোকলশকর, হাতি-ঘোড়া, নাচ-গান, খাদ্য-পানীয়, শিকার এসব তার স্মৃতিতে তোলপাড় তোলে। হিরাবালা বাধা পায়, ভাবে ভিন্ন কথা, অন্য মানুষের কথা। সে ভাবে আর ভাবে, ক্রমে শুনতে পায় কুমারবাহাদুরের সুর।

ওহ, কী স্বরের মূর্ছনা, কী ভরাট গলা। যেন অতীন্দ্রিয় অনুভবে ভরা। এ-গলার আওয়াজ মনের কানে ভেসে এলে হিরা গুনগুন করে, আবার কখনও খোকাকে বুকে সাপটে ধরে বলতে শুরু করে—

"মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

এ কবিতা আবৃত্তি করতে-করতে দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল মুছতে-মুছতে দ্যাখে শিশু পান্না হাঁ হয়ে চেয়ে আছে।

পান্না একটু-একটু করে বড় হয়। দিনভর হিরা বাইরে-বাইরে থাকে, কোথাও নাটক-অভিনয়ের মহলা, কখনও আবৃত্তি পাঠের আসর, এসব নিয়ে তাকে মেতে থাকতে হয় রোজগারের তাগিদে। তাকে ছুটতে হয় এ-মাথা থেকে ও-মাথা। শেষে ক্লান্ত পা ফেলে ফিরে চলে যায় ঘরে। খোপে ঢুকতে-ঢুকতে সূর্য মাঠের পশ্চিম কোলে হেলে পড়ে, আকাশের জমিতে বাঁকা-চাঁদের মিঠে-আলো সমস্ত গাছে-পাতায়, গম্বুজে-দালানে অশরীরীর ছায়া ফেলে নেচে-নেচে বেড়ায়। ছোট খোকা পান্না ডুকরে কেঁদে ওঠে। হিরা বাছাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। তার পায়ের পাশে লেজ নাড়ে মোতি, গড়াগড়ি খায়। হিরা ম্লান হাসি হেসে বলে, "কী রে, ঠিক-ঠিক পাহারা দিয়েছিস তো! তুই তো ভরসা।" পরে থলে থেকে শস্তা দামের বিস্কুট তুলে মুখে ছোঁড়ে, মোতি সামনের দু'পা ওপরে তুলে ছোঁ মেরে মুখে পোরে। ...হিরা বুড়োর দিকে ঘাড় ফেরায়। বুড়ো পলক না ফেলে তার মুখের পরে চেয়ে আছে দেখে মায়াঝরা গলায় বলে, "চেয়ে-চেয়ে কী দেখছ? খেয়েছ তো?"

সে কথার সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে বোঝায়। বুড়ো ঘাড় নাড়ে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা জল।

হিরা স্নেহ-মমতায় আপ্লুত হয়ে মুছিয়ে

দেয়, হাসে, বলে, "কাঁদছ কেন ? আমি তোমায় ফেলে যাব না কক্ষনো।"

এমনই করেই তাদের দিন গড়িমসি চালে চলে, কাটে কোনওমতে।

দেবতার রাজ্যে দুঃখী-মনের লোকদের দিন সহজে গড়ায় না। বড় হতে-হতে শেকড়ে-বাকড়ে আটকে থাকে, থমকে থামে আর তখনই টাল সামলানো দায় হয়ে পড়ে। বুড়োর চোখে আলো নিভে আসে। বুড়ো নেতিয়ে পড়ে বার্ধক্যের যন্ত্রণায় ও অসুখের জ্বালায়। হিরার কাজ বাড়ে, বিপদও। সে কাজে যেতে পারে না। ঘরে থাকে, পথ্য জোগায়, ওষুধ-বদ্যি করে। ছেলে খিদের জ্বালায় কাঁদে, গড়াগড়ি দেয়। হিরা এসে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করে।

শেষে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ে তারা একে-একে গাছপালা বেচতে শুরু করে। কাঠের কারবারিরা তাল বুঝে শস্তা দামে তা গোলায় ভরে। বুড়ো শূন্যে দৃষ্টি রেখে কড়িকাঠ গোনে। দিন ফুরিয়ে আসে, হিরা অভাবে-অনটনে বুড়িয়ে যায়, বাড়ি বেচার কথা পাড়ে। কিন্তু বুড়োর তাতে সায় নেই। তা ছাড়া ও-বাড়ির কাগজপত্তরে আরও কারও-কারও সই-সাবুদ দরকার। হিরা চিঠিতে যোগাযোগের চেষ্টা করে, সাড়া মেলে না। শেষমেশ পুরনো গম্বুজ-দালানবাড়ির ইট-কাঠ কড়ি-বরগা খুলে-খুলে বেচে খায়। এতে কোনওমতে দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্য পাতে পড়ে, পরান ভরে না। দিন গুজরান হয়।

একদিন সাঁঝ গড়িয়ে রাত অমাবস্যার গাঢ়-কালো আঁধারে ঢুকে যায়। ঘন নিবিড় রাত ছেঁকে ধরে আশপাশের ঝোপ-জঙ্গল, ঝিঁঝির ডাক একটানা বেজে চলে। দূরে কোথাও পেঁচা কেঁদে ওঠে। হিরার মাথায় রাজ্যের খেদ। পান্নার ভাবনা, বুড়োর শেষ-দশা। সব মিলিয়ে তার পাগল হওয়ার জো, দুশ্চিন্তায় গাঢ় করে শ্বাস ছাড়ে আর চোখ চেয়ে অকূলপাথার ভাবে। ঝিঁঝির রব ফিকে হয়ে এলেই কানে বাজে বুড়োর গোঙানি। একই চালার তলায় এককোণে মরো-মরো বুড়ো, আর পাশে কচি-শিশু, মাঝে হিরা সাড়হীন ভাবনায় ঢলে পড়ে। বিশ্বস্ত পাহারায় বহাল থেকে মোতিও ঝিমোয়।

ও-বাড়ি হঠাৎ করে গাছশূন্য হয়ে পড়াতে বিশাল সমুদ্রে বিরাট আকৃতির পাথরের চাঁই-এর মতো টিকে আছে। নিঃসঙ্গ আর কালের তোলপাড়ে ক্ষত-বিক্ষত। হিরা মুষড়ে পড়ে থই না পেয়ে। হাওয়ার বেগ নৌকোর পালের মতো খাড়া-থাকা গম্বুজের গায়ে দাপাদাপি করে শনশন শব্দ তোলে। সহসা দমকা বাতাসে ঘরের নিবু-নিবু দীপ নিভে যায়। বুড়ো শেষ শ্বাস ছেড়ে ঘাড় কাত করে। হিরা সাঁঝের আলো হাতড়ে ফেরে।

এখন গম্বুজ-দালানবাড়ির ভাঙা-ঘরের টিন খোলা, মাঝ-উঠোনে বিশাল ইঁদারা হাঁ-মুখ করে খাড়া আছে। আর আছে দরিয়ার দিকহারা নাবিকের চোখে জাহাজের মাস্তুলের মতো ঊর্ধ্বমুখী গম্বুজ। ভরা বাদলের এক সাঁঝবেলায় পান্নার হাত ধরে পুঁটুলি-বগলে হিরাকে পথে দেখা গিয়েছিল, পিছু-পিছু মোতি। সেদিন মোতির হাঁ-মুখে ছিল হিরাবালার গুলবাহারি শাড়ির আঁচল। আর হিরার মুখ ছিল অনাবৃত। আ-ঢাকা মুখে বৃষ্টিভরা মেঘের মতো টলটলে জল থতমত খেয়ে আটক হয়ে পড়েছিল।

ছবি : দেবাশিস দেব

আকাশে ওড়ার কথা □ তেত্রিশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানে বিশ্বপরিক্রমা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডগলাস ডি ডাবলু সি-০৫ ওয়ার্ল্ড ক্রুসার হল প্রথম বিমান, যা বিশ্বপরিক্রমা করে আসে। এতে সাধারণ চাকা ছাড়াও জলে নামার জন্য ফ্লোট লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল চারটি ডি ডাবলু সি বিমান—শিকাগো, নিউ অরলিন্স, বস্টন ও সিয়াটেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে সিয়াটেল শহর থেকে বিশ্বজয়ের জন্য আকাশে ওড়ে। বৈমানিকেরা ছিলেন লোভেল স্মিথ, এরিক নেলসন, লে ওয়েড, আরনল্ড, হার্ডিং, লটন, ওগডেন ও দলপতি মেজর মার্টিন। মেজর মার্টিন ৩০ এপ্রিল প্রবল কুয়াশার মধ্যে আলাস্কার পাহাড়ে ক্র্যাশ করেন, পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়, কিন্তু তিনি এই অভিযানে অংশ নিতে পারেননি। সিয়াটেল থেকে আলাস্কা, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হয়ে বিমানগুলি কলকাতায় আসে ২৬ জুন বেলা তিনটেয়। ওড়ার সময় লাগে ১৬২ ঘন্টা ২৮ মিনিট। কলকাতায় বিমানগুলি নামে ব্যারাকপুরের কাছে নবাবগঞ্জে, গঙ্গাবক্ষে। বিমানগুলিকে অভ্যর্থনা জানায় মার্কিন নৌবাহিনীর চারটি ডেস্ট্রয়ার। এ ছাড়া বহু লোক নদীর দু'ধারে বা গঙ্গায় নৌকায় চড়ে নানা রঙের পতাকা নেড়ে তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করেন। ২৮ তারিখে বিমানগুলি নবাবগঞ্জ থেকে উড়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রিন্সেপঘাটের কাছে নামে। এর পর ক্রেন দিয়ে বিমানগুলিকে ডাঙায় তুলে চাকা লাগানো হয় ও নিয়ে যাওয়া হয় ময়দানের এলেনবরো কোর্সে। ১ জুলাই তিনটি বিমান কলকাতা ছেড়ে উড়ে যায় এলাহাবাদের দিকে। মধ্য-প্রাচ্য, ইউরোপ ও কানাডা হয়ে বিমানগুলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার কথা। কিন্তু আরও একটি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাত্রা-বিরতি করে। অবশেষে দুটি বিমান—শিকাগো ও নিউ অরলিন্স, নিরাপদে সিয়াটেল ফেরে বিশ্বজয় করে। ২৮,০০০ মাইল পথ-পরিক্রমা করতে সময় লাগে ১৭৫ দিন বা ওড়ার সময় ধরে ৩৭১ ঘন্টা।

বিশ্বপরিক্রমাকারী ডগলাস বিমান

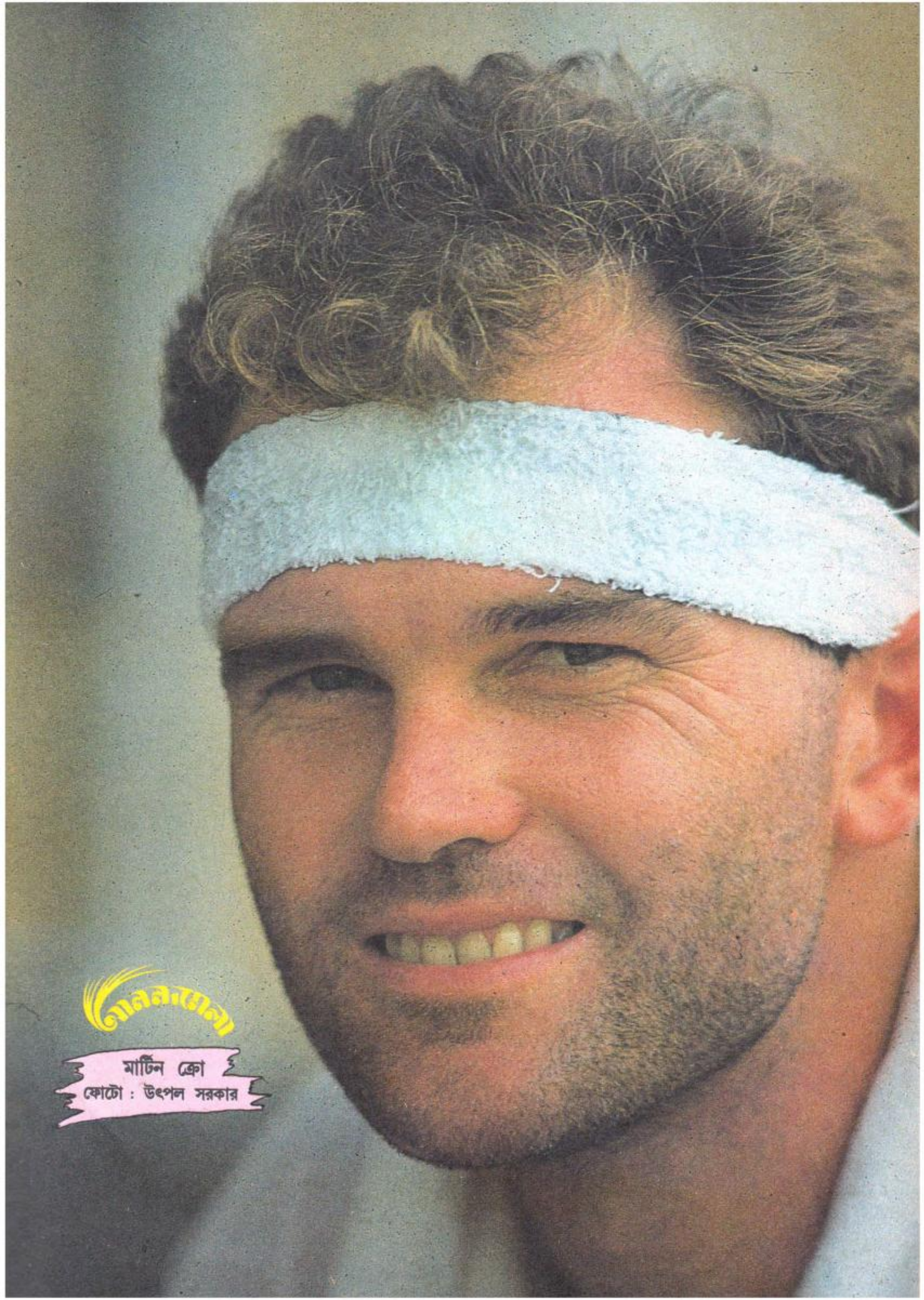

মার্টিন ক্রো
ফোটো : উৎপল সরকার

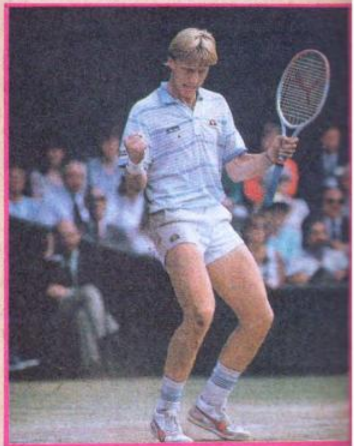

বরিস বেকার

জয় নয়, শুধু ফাইনালে উঠেই একটা দারুণ রেকর্ড করে ফেলতে পারেন ইভান লেণ্ডল। উইম্বলডনে তাঁর ভাগ্য যতই খারাপ হোক, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর টেনিস স্টারের কাছে আশা জাগিয়েছে। তিনবার জিতেছেন ইউ এস ওপেন, তার চেয়েও বড় কথা পরপর আটবার তিনি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এবারও যদি ফাইনালে উঠতে পারেন, তবে এক অনন্য নজির গড়বেন। কেননা টানা আটবার, ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত, ফাইনালে ওঠার রেকর্ড ছিল যুক্তরাষ্ট্রেরই বিল টিলডেনের। গতবার সেই রেকর্ড ছুঁয়েছেন লেণ্ডল, ১৯৮২ সাল থেকে ফাইনালে খেলছেন তিনি। লেণ্ডল নিজে এই রেকর্ডের চেয়েও বেশি আগ্রহী জিততে। তিনি বলেন, "রেকর্ড করতে আমি খেলি না, খেলি জিততে। তারপর যদি রেকর্ড হয় হোক।" বলা বাহুল্য, লেণ্ডল যদি জেতেন, তবে অবশ্য রেকর্ডও গড়বেন।

তবে নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাশিং ম্যাডোর হার্ড কোর্টে এবার লেণ্ডলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। সদ্য উইম্বলডন জেতা স্টেফান এডবার্গ ভাল ফর্মে আছেন, সঙ্গে আছে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। লেণ্ডলকে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে হারিয়েছিলেন এডবার্গই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এডবার্গ জানিয়েছেন, এ-বছরই টেনিসের এক নম্বর হওয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং তার জন্যই জরুরি

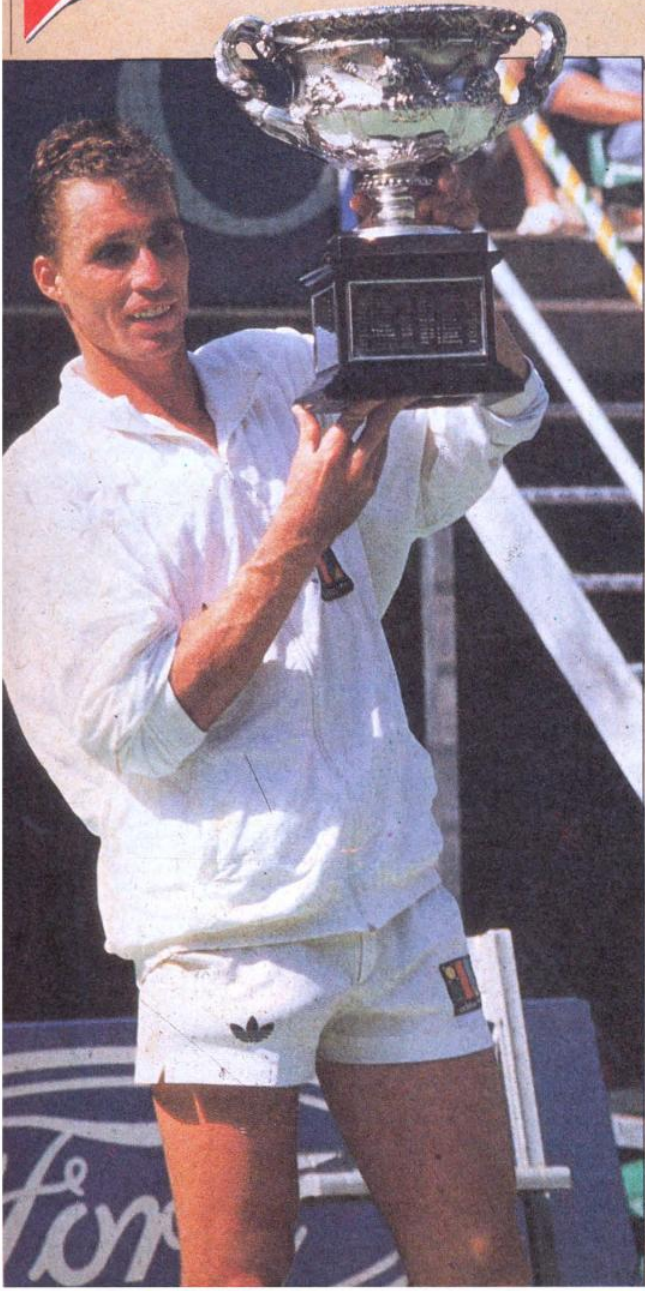

রেকর্ড গড়তে পারেন লেণ্ডল

চ্যাং

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

১৯৮৮ সালের বিজয়ী ম্যাটস ভিল্যাণ্ডার এবং জন ম্যাকেনরোও কি সহজে ছেড়ে দেবেন ? ম্যাকেনরোর প্রতিভাকে ভয় খান না, এমন খেলোয়াড় সার্কিটে কমই আছেন । গতবার এখানে বেশ ভাল ফর্মে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রেরই তরুণ আন্দ্রে আগাসি । উইম্বলডনে না খেলে এবারে আগাসি নিজেকে তৈরি করেছেন ইউ এস ওপেনের জন্য ।

অঘটন ঘটাতে পারেন আরও অনেকে—মাইকেল চ্যাং, নোয়া, গঞ্জালেস, এ ছাড়াও কোনও অখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী । যেমন গতবার ম্যাকেনরোকে পল হ্যারিয়াস যেন আকাশ থেকে নেমে এসে ধ্বংস করে দিয়ে যান । এবারও সেরকম হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই ।

তেত্রিশ বছর বয়সী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা এখনও হেসেখেলে যেভাবে জিতে চলেছেন, তাতে তাঁকে ইউ এস ওপেনেও আটকানো

ইউ· এস· ওপেন টেনিস জিতবে কারা

যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন **সুজিত রায়**

ইউ এস ওপেন জেতা । জরুরি কাজটা করতে পারবেন কি এডবার্গ ?

গতবারের বিজয়ী বরিস বেকারও এবার জয়ের লক্ষ্যে তৈরি । তিনি উইম্বলডনে ফাইনালে হেরেছেন এডবার্গের কাছে । সেই ক্ষোভ, রাগ হয়তো সুদে-আসলে উসুল করে নেবেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ।

গত দশ বছরের বিজয়ীরা

পুরুষ	মহিলা
১৯৮০—জন ম্যাকেনরো	১৯৮০—ক্রিস এভার্ট
১৯৮১—জন ম্যাকেনরো	১৯৮১—ট্রেসি অস্টিন
১৯৮২—জিমি কোনর্স	১৯৮২—ক্রিস এভার্ট
১৯৮৩—জিমি কোনর্স	১৯৮৩—মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা
১৯৮৪—জন ম্যাকেনরো	১৯৮৪—মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা
১৯৮৫—ইভান লেণ্ডল	১৯৮৫—হানা মাণ্ডলিকোভা
১৯৮৬—ইভান লেণ্ডল	১৯৮৬—মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা
১৯৮৭—ইভান লেণ্ডল	১৯৮৭—মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা
১৯৮৮—ম্যাটস ভিল্যাণ্ডার	১৯৮৮—স্টেফি গ্রাফ
১৯৮৯—বরিস বেকার	১৯৮৯—স্টেফি গ্রাফ

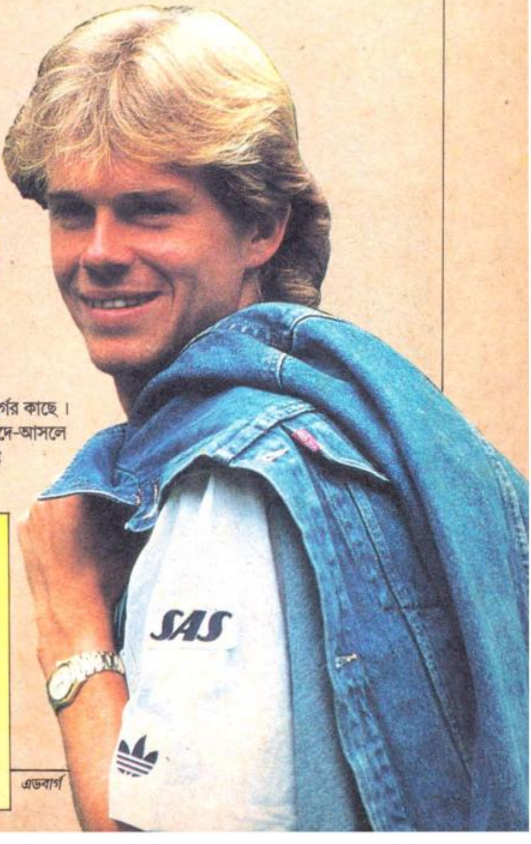

এডবার্গ

এবারে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন যে জমে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জমবে এই কারণে যে, এখানে জেতাটা সত্যিই খুব শক্ত। শুধু বিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, মনঃসংযোগ নষ্ট করার জন্য থাকে আরও অনেক কিছু। যেমন, দর্শকদের প্রবল চিৎকার, ক্ষণে-ক্ষণে মাথার ওপর দিয়ে উড়োজাহাজের উড়ে যাওয়া এবং প্রবল গরম। গত বছর এখানে গরম ছিল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

স্টেফি গ্রাফ ও মণিকা সেলেস

শক্ত হবে। গতবার মার্টিনা ফাইনালে হারেন স্টেফি গ্রাফের কাছে। এবার কি হারানোর পালা? উইম্বলডনে ন'বার জয়ের রেকর্ড করার পর মার্টিনা এবার ইউ এস ওপেন জেতার জন্য ঝাঁপাবেনই।

পক্ষান্তরে গতবারের বিজয়িনী স্টেফি গ্রাফ অনেকদিন পরে ভাল ফর্মে নেই। পারিবারিক নানা ঝামেলায় তিনি মানসিকভাবে ঠিক সুস্থ ছিলেন না। ফ্রেঞ্চ ওপেনে সুবিধে করতে পারেননি, হেরেছেন উইম্বলডনেও। তবে, যেহেতু তিনি স্টেফি গ্রাফ, ঘুরে দাঁড়াবেন হয়তো যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই। স্টেফির কাছে

জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি

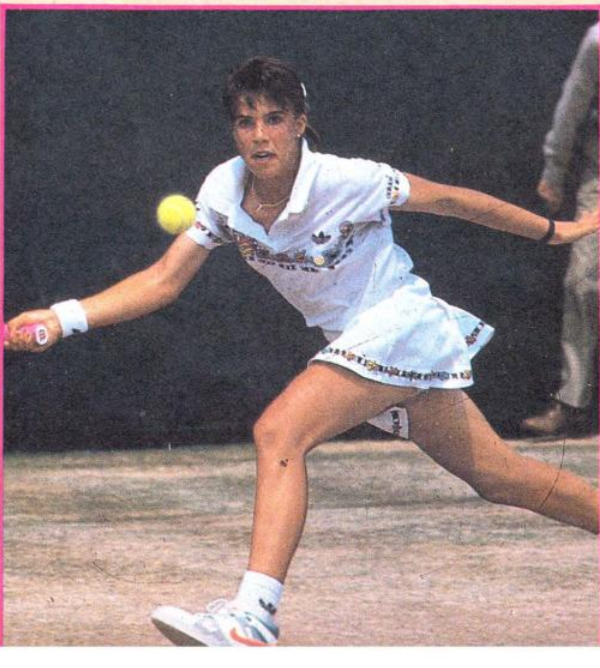

এই টুর্নামেন্ট একটা চ্যালেঞ্জ, এটিই সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগিতা। স্টেফি বলেন, "উইম্বলডন কঠিন, মর্যাদা ও ঐতিহ্যের কারণে। ফরাসি ওপেনের ক্লে কোর্টে নিজেকে নিংড়ে দিতে হয়। কিন্তু এখানে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলতে হয় পরপর দু'দিনের মধ্যে। হার্ড কোর্টে ব্যাপারটা প্রায় অমানুষিক।"

গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি, জিনা গ্যারিসন, মোনিকা সেলেস এবং জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি পথ জুড়ে আছেন মার্টিনা ও স্টেফির। সদ্য জীবনের প্রথম পেশাদারি খেতাব পাওয়া চতুর্দশী ক্যাপ্রিয়তি এবং তরুণী মোনিকা যে-কোনও দিন নক্ষত্র-পতন ঘটাতে পারেন। সুতরাং এবারে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন যে জমে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জমবে এই কারণে যে, এখানে জেতাটা সত্যিই খুব শক্ত। শুধু বিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, মনঃসংযোগ নষ্ট করার জন্য থাকে আরও অনেক কিছু। যেমন, দর্শকদের প্রবল চিৎকার, ক্ষণে-ক্ষণে মাথার ওপর দিয়ে উড়োজাহাজের উড়ে যাওয়া এবং প্রবল গরম। গত বছর এখানে গরম ছিল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অনেকে এবার একজনের অভাব অনুভব করবেন। তিনি হলেন ক্রিস এভার্ট। গতবারই তিনি জীবনের শেষ বড় টুর্নামেন্ট খেললেন এখানে। এবারও আসবেন তিনি এখানে, তবে ভাষ্যকার হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তিনি অস্বীকার করবেন কী করে?

যেন রূপকথার চরিত্র জিনা গ্যারিসন

নিগ্রো টেনিস-তারকা জিনা গ্যারিসনকে নিয়ে লিখেছেন **সুব্রত সরকার**

জিনা গ্যারিসনকে এখনও মেয়েদের টেনিস-তারকাদের মধ্যে ধরা হয় না। তবে পাবলিক পার্কে খেলা শেখা এই নিগ্রো মেয়েটি তো ইদানীং বেশ কয়েকটি বড় টুর্নামেন্টে সুপার-স্টারদের 'আপসেট' করেছে। দু' বছর আগে ইউ এস ওপেনে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে হারান জিনা, আর গত বছর ওই প্রতিযোগিতাতেই তিনি হারিয়ে দেন ক্রিস এভার্টকে। তারপর তো এবারকার উইম্বলডনে জিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান স্টেফি গ্রাফকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন।

হুস্টন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকের অন্যতম বড় শহর। জিনা সেখানকার মেয়ে, ২৭ বছর আগে হুস্টনেই তাঁর জন্ম। তাঁর পরিবার থাকতেন শহরের দক্ষিণের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত এলাকায়। জিনার বাবা ছিলেন পোস্টম্যান, মা এক নার্সিং হোমে কাজ করতেন। জিনার জন্মের বছরখানেকের মধ্যে

জিনার কাছে সোল ওলিম্পিকে দেশের হয়ে মেয়েদের ডাবলসে স্বর্ণপদক জেতা খেলোয়াড়-জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এবার জিনা উইম্বলডন ফাইনালে সুবিধা করতে পারলেন না। তবে ভবিষ্যতে কোনও বড় টুর্নামেন্ট জিতলে সাধারণ ঘরের নিগ্রো মেয়েটির সাফল্যের কাহিনী রূপকথার মতো মনে হবে।

মারা যান তাঁর বাবা। তারও কিছুদিন আগে জিনার বড় দাদা, এক পেশাদার বেসবল প্লেয়ার, খেলায় আহত হন ও মারা যান। জিনার মা নিজেই কষ্ট করে থাকি ছয় ছেলেমেয়েকে মানুষ করেন—তাদের মধ্যে জিনাই সবচেয়ে ছোট। রাস্তায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ বা সফ্‌টবল খেলায় জিনার দক্ষতা দেখে তাঁর এক দাদা ছোট্ট বোনকে নিয়ে যান ম্যাকগ্রেগর পার্কে। হুস্টনের এই পাবলিক পার্কে জন উইলকার্সন নামের এক আধা-পেশাদার কোচের অধীনে গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের কোচিং-স্কিম চালু ছিল।

জিনার জন্মের কয়েক বছর আগে প্রথম এক নিগ্রো খেলোয়াড় টেনিস-বিশ্বের নজর কাড়েন। অলটিয়া গিবসন ১৯৫৬ সালে ফরাসি চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পরে দু' বছর উইম্বলডন আর মার্কিন চ্যাম্পিয়ানশিপ জেতেন। অলটিয়া ছিলেন এক দরিদ্র ভাগচাষির মেয়ে। তাঁর সাফল্যের কয়েক বছর পর এক পুলিশম্যানের পুত্র আর্থার অ্যাশ পুরুষদের বিভাগে প্রথম নিগ্রো চ্যাম্পিয়ান হন, প্রথমে ১৯৬৮-তে ইউ এস

ওপেনে, তারপর ১৯৭৫-এর উইম্বলডনে। অলটিয়া গিবসনকে যতটা সংগ্রাম করতে হয়েছিল, জিনাকে ওরকম কষ্ট করতে হয়নি। তবে, তাঁর পক্ষেও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেওয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের ব্যাপার। জিনা উইলকার্সনের কাছে যখন প্রথম যান, তখন বয়স দশ। ১৯৮১-তে তিনি উইম্বলডন আর ইউ এস ওপেন, দুটি টুর্নামেন্টেই বালিকাদের সিঙ্গল্‌স জেতেন। পরের বছর তাঁর পেশাদার খেলোয়াড়ের জীবন শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৫-তে জিনা উইম্বলডনের সেমিফাইনাল অবধি যান। তবে, এবার পর-পর ম্যাচে মোনিকা সেলেস আর স্টেফিকে হারিয়ে জিনা প্রথম এক গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বছরখানেক হল জিনা বিয়ে করেছেন। তাঁর কাছে সোল ওলিম্পিক গেম্‌সে দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জেতা (মেয়েদের ডাব্‌লসে) খেলোয়াড়-জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ছিল। এবার জিনা উইম্বলডন ফাইনালে সুবিধা করতে পারলেন না। তবে, ভবিষ্যতে কোনও বড় টুর্নামেন্ট জিততে পারলে এই সাধারণ ঘরের নিগ্রো মেয়েটির সাফল্যের কাহিনী রূপকথার মতো মনে হবে।

জিনা গ্যারিসন

সর্বকালের সেরা বিশ্ব একাদশ

চতুর্দশ বিশ্বকাপের শেষে সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের নিয়ে একটি স্বপ্নের দল গড়েছেন 'অবজার্ভার' পত্রিকার সাংবাদিক ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকঘি

সর্বকালের সেরা দল গড়া যে এত ঝামেলার, তা কে জানত ! তিরিশ থেকে নব্বই সাল পর্যন্ত ভাল ফুটবলার তো কম জন্মাননি । এই এত ভাল-র মধ্যে মাত্র এগারোজনকে বাছাই করার পর তা অনেকেরই পছন্দ হবে না আমি জানি । আমারই হয়তো হত না । তবু একটা দল গড়ার চেষ্টা করে দেখাই যাক না !

একটা সমস্যা থেকে প্রথমেই মুক্ত হওয়া গেছে । দু'জন ফুটবলার প্রথমেই তালিকার বাইরে চলে গেছেন । এঁরা হলেন উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের জর্জ বেস্ট এবং আর্জেন্টিনা ও স্পেনের আলফ্রেদো ডি স্টেফনো । বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে এঁরা কখনও খেলতে পারেননি । খেললে এই দুই অসাধারণ ফুটবলারকে দলে নিতে হতই । ভাগ্যিস এটি সর্বকালের বিশ্বকাপ-একাদশ ! তাই এই দু'জনকে বাদ দিয়েই আমাদের সেরা দলটি মাঠে নামবে । এঁরা খেললে অন্য দুই সেরা-র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত । মুশকিলে পড়তাম আমরা ।

সমস্যা কিন্তু মিটল না । আমার বন্ধু জিমি হিলের গল্পটা বলি । জিমি বিখ্যাত টিভি ভাষ্যকার । ওকে একটি প্রোগ্রাম করতে বলা হয়েছিল বি বি সি-তে । পেলে, মারাদোনা, ইউসেবিও, গ্যারিঞ্চা, যোহান ক্রুয়েফ এবং ববি রবসনের মধ্যে সেরা গোলপিপাসু কে—এইরকম একটা প্রশ্ন করা হয় ওকে । উত্তরে পেলে থেকে রবসন সবারই নাম বলে । জিমির মতে, সেরা বাছাই অসম্ভব । এই অসম্ভব কাজটা করতে প্রথমেই তিন কাঠির নীচে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটির দিকে তাকাই ।

আমার পছন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের লেভ ইয়াসিন । ছ' ফুটের ওপর লম্বা, শরীরটাকে ইলাসটিকের মতো বাড়াতে-কমাতে পারে, বিরাট একজোড়া হাত এবং যখন কোনও ক্রস ভেসে আসে তা বাজপাখির তীক্ষ্ণতায় ছিনিয়ে নিতে ওস্তাদ ইয়াসিন । জার-রা যেমন ছিলেন নিজের এলাকায় একেশ্বর, তেমনই পেনাল্টি বক্সের মধ্যে লেভের একাধিপত্য ছিল

যোহান ক্রুয়েফ

ববি মুর

মারাদোনা

সংশয়াতীত। অতি দক্ষতায় তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন ইয়াসিন। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় লেভকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে ইংল্যান্ডের গর্ডন ব্যাঙ্কস। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উঁচু মানের গোলরক্ষক কিন্তু সর্বকালের সেরা দলে এক নম্বর জার্সি পরবেন লেভ ইয়াসিনই।

আমাদের চার ব্যাকের মধ্যে ডান দিকে থাকবেন ডালমা স্যান্টোস, ব্রাজিলের সেই লৌহকঠিন মানুষটি। একজন ডিফেণ্ডারের যা হওয়া উচিত স্যান্টোস ছিলেন ঠিক তাই। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথা, শরীর ছিল দৃঢ়। স্যান্টোসকে ক্লাব-জীবনে সর্বদাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন আক্রমণ প্রতিরোধ করে যেতে হয়েছে। সেই ঝোড়ো আক্রমণ ব্রাজিলের ফরওয়ার্ডদের। স্যান্টোস শতাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন, অংশ নেন চারটি বিশ্বকাপে। স্যান্টোসের বিশেষত্ব ছিল, বিপক্ষের ফরওয়ার্ডের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে তবেই তাকে ছাড়তেন।
বাঁ দিকে থাকবেন ইংল্যান্ডের এক ভুলে যাওয়া ফুটবলার—রে উইলসন। উইলসনের ট্যাকল করার সময়জ্ঞান ছিল একেবারে নিখুঁত। অন্য দলের ফরওয়ার্ডদের ধ্বংস করার পরই শান্ত হতেন উইলসন। এত ভাল ট্যাকলার পৃথিবীতে খুব কমই এসেছেন।

আর-এক ডিফেণ্ডারও ইংল্যান্ডের—জন চার্লস। খেলেছেন ওয়েলস, লিডস এবং জুভেন্টাস ক্লাবে। আক্রমণ রোখার থেকে গোল করেই তিনি বেশি নাম পেয়েছেন। খেলতেন সেন্টার-হাফে। কিন্তু পছন্দসই জায়গা ছিল ডিফেন্সে, মাঝখানে। কমপ্লিট ফুটবলার বলতে যা বোঝায়, চার্লস ছিলেন তাই। চোদ্দ স্টোনের ওপর ওজন, লম্বায় ছ' ফুট ছাড়িয়ে, গতিতে খেলতেন না। পায়ের কাজে আটকে দিতেন বিপক্ষকে।
এই তিনজনের সঙ্গে রক্ষণের শেষ স্তম্ভ হবেন ববি মুর। কোন আক্রমণটা বিষমাখা তা বুঝতে ববি মুরের মতো দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে দেখা যায়নি। পরিস্থিতির এত ভাল মোকাবিলা করতেন, যা দলকে প্রায়ই বিপন্মুক্ত করত। মুরের আর-একটি সম্পদ ছিল নিখুঁত সময়জ্ঞানের কঠিন ট্যাক্‌ল। বল সরবরাহও তাঁর ছিল চমৎকার, সঠিক লক্ষ্যে বল পৌঁছে যেত। কতটা সঠিক ছিল তা বলতে পারেন সমসাময়িক মার্টিন পিটার্স অথবা জিওফ হার্স্ট।
মাঝমাঠেও লড়াই তীব্র। অথচ আমাদের ছকে চারজন ডিফেণ্ডারের পরই দু'জন মাত্র লিঙ্কম্যানের স্থান। পাহারা দেওয়া এবং বল ছিনিয়ে নেওয়া এই দুই কাজে দক্ষ কত খেলোয়াড়ের ছবি চোখের সামনে ভাসছে, ইতালির জেন্টিল ও বেনেটি, পশ্চিম জার্মানির উইলি সুলৎজ এবং স্কটল্যান্ডের ব্রেমনার ও ম্যাকি—এঁদের কয়েকজন। কিন্তু অল রাউন্ড দক্ষতা, প্রয়োজনীয় স্ট্যামিনা এবং বেসিক স্কিলের দিক দিয়ে আমার ভোট পড়বে ব্রায়ান রবসন এবং ফ্রান্‌জ বেকেনবাওয়ার-এর দিকে।
ইংল্যান্ডের ব্রায়ান রবসন অসাধারণ মানের ফুটবলার, অন্যদের প্রেরণা দেওয়ার মতো তাঁর দক্ষতা। দলগত খেলায় তাঁর কোনও তুলনা আছে বলে আমি মনে করি না। আর মধ্যমাঠ যেন তৈরিই হয়েছে পশ্চিম জার্মানির বেকেনবাওয়ারের জন্য। খেলা তৈরিতে, বুঝতে, নিয়ন্ত্রণে কাইজারের কোনও তুলনা আছে কি ? বেকেনবাওয়ারের এক-একটা পাস ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যেত বিপক্ষ রক্ষণকে।
আক্রমণভাগে খেলোয়াড়দের মধ্যে ডান দিকে কে থাকবেন ? আমার ইচ্ছে করছে, স্ট্যানলি ম্যাথুজকে রাখতে। কিন্তু গতি, স্কিল এবং শুটিং দক্ষতায় দলে আসবেনই ব্রাজিলের দুরন্ত, ছুটন্ত জাদুকর গ্যারিঞ্চা। গ্যারিঞ্চা না থাকলে আক্রমণে ঝড় তুলবেন কে ? বাঁ দিক থেকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন যোহান ক্রুয়েফ। হল্যান্ডের এই প্রতিভাধর ফুটবলারটির মাথা একটু গরম বটে, কিন্তু যখন আক্রমণে যান তখন দর্শকদের উত্তেজনায় টানটান করে রাখেন। ড্রিবলিং ব্যাপারটা কতটা দৃষ্টিনন্দন হতে পারে ক্রুয়েফ তা দেখিয়েছেন।
আর মাত্র দুটো জায়গা বাকি আছে। দুই স্ট্রাইকারের জায়গা। এবং আমাদের দলে এখনও আসেননি পৃথিবীর এক এবং দু' নম্বর ফুটবলার—পেলে ও মারাদোনা। এঁদের দলে নেওয়ার সমর্থনে একটিও শব্দ আমি খরচ করতে নারাজ।
স্বপ্নের দলটি তৈরি। দলটির অধিনায়ক কে হবেন ? না, আর নতুন কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে আমি রাজি নই।

গ্যারিঞ্চা

পেলে

রেকর্ড ভেঙে চলেছেন গ্রেম হিক

এখনও টেস্ট না খেললেও গ্রেম হিককে তুলনা করা হচ্ছে ব্রাডম্যানের সঙ্গে । কেন ? আলোচনা করেছেন **প্রবীর বসু**

একটিও টেস্ট না খেলে রেকর্ড-বইয়ে স্থান পাওয়া যেমন সহজ কথা নয়, তেমনই সহজ নয় ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ সার ডন ব্রাডম্যানের নামের আগে নিজের নাম লিখে ফেলা । এরকম একটি দুর্দান্ত ব্যাপার যে তরুণটি অতি সহজে করে ফেলেছেন, তাঁর নাম গ্রেম অ্যাশলে হিক । জিম্বাবোয়ের চব্বিশ বছরের এই তরুণ কয়েক বছর ধরেই 'ক্রিকেটের বিস্ময়' হিসেবে পরিচিত । ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে একের-পর-এক রেকর্ড ভেঙে বিস্মিত করে চলেছেন হিক । হিক নতুন কীর্তিটি তৈরি করেছেন চলতি মরসুমে । সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর খেলায় পঞ্চাশতম শতরানটি করেন হিক দিনকয়েক আগে উরস্টারশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগানের বিপক্ষে । এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙলেন বহুদিন আগে গড়া ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের রেকর্ড । ১৯৩৪ সালে ব্রাডম্যান যখন তাঁর পঞ্চাশতম শতরানটি করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ । হিকের পঞ্চাশতম শতরানটি এল যখন তাঁর বয়স ২৪ বছর ৫২ দিন, এবং ২৪৯ নম্বর ইনিংসে । অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি পাঁচ ইনিংসের একটিতেই শতরান করেছেন হিক । ব্রাডম্যান ছাড়া এমন ধারাবাহিক কৃতিত্ব আর কারও নেই । ব্রাডম্যানের রেকর্ড অবশ্য আরও ভাল । তিনি পঞ্চাশটি শতরানের জন্য নিয়েছেন মাত্র ১৭৫টি ইনিংস ।

অবশ্য হিকের রেকর্ড-সংখ্যা অজস্র । আপাতত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সাত মরসুমে হিকের রান প্রায় চোদ্দ হাজার । গড় প্রায় ৬৪ । এত ভাল গড় মাত্র চারজন ক্রিকেটারের রয়েছে, তাঁরা আবার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার । ভারতের বিজয় মার্চেন্ট, অস্ট্রেলিয়ার বিল উডফুল, বিল পন্সফোর্ড এবং প্রবাদপুরুষ ব্রাডম্যান ।

গ্রেম হিকের জন্ম পূর্বতন রোডেশিয়া, বর্তমানের জিম্বাবোয়ের হারারেতে, ১৯৬৬ সালের ২৩ মে । বাবা জন হিকও ক্রিকেট খেলতেন । সাড়ে ছ' বছর বয়সেই হিক খবর হয়ে ওঠেন—স্থানীয় একটি খেলায় বড়দের বলকে পিটিয়ে সেঞ্চুরি করে । তারপর স্কুলস্তরে ক্রমাগত সাফল্য দেখে ১৯৮৩-এর জিম্বাবোয়ের বিশ্বকাপ দলে তাঁকে নেওয়া হয়, যদিও খেলার সুযোগ মেলেনি । পরের বছরই স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের উরস্টারশায়ারে যোগ দেন হিক । এবং তারপরই শুরু হয় রেকর্ড গড়ার পালা । সেবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে জীবনের প্রথম, প্রথম শ্রেণীর ম্যাচেই ২৩০ রান করেন, যে কৃতিত্ব খুব কম ক্রিকেটারেরই আছে । ১৯৮৬ সালে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যাণ্ডে এক মরসুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দু' হাজার

হিকের রেকর্ড-সংখ্যা অজস্র । আপাতত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সাত মরসুমে হিকের রান প্রায় চোদ্দ হাজার । গড় প্রায় ৬৪ । এত ভাল গড় মাত্র চারজন ক্রিকেটারের রয়েছে, তাঁরা আবার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার । ভারতের বিজয় মার্চেন্ট, অস্ট্রেলিয়ার বিল উডফুল, বিল পন্সফোর্ড এবং প্রবাদপুরুষ ব্রাডম্যান ।

রান করেন । এর আগের রেকর্ডটি ছিল লেন হাটনের । দু' বছর বাদে সমারসেটের বিরুদ্ধে করলেন বিধ্বংসী নট আউট ৪০৫ রান । কাউন্টি ক্রিকেটে তো বটেই, ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও এই শতাব্দীর এ এক অনন্য কৃতিত্ব, আর কেউই করতে পারেননি । এর আগে ১৮৯৫ সালে আর্চি ম্যাকলারেন করেছিলেন ৪২৪ রান । এই মরসুমেই আবার একটি কীর্তি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান যিনি মে মাসের মধ্যে কাউন্টি ক্রিকেটে হাজার রান করেন । ওই মরসুমে তাঁর সংগ্রহ সর্বমোট ২৭১৩ রান । ১৯৬৯ সালে কাউন্টি ক্রিকেটে ম্যাচের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পর কোনও ব্যাটসম্যান এক মরসুমে এত রান পাননি । হিকের রানের খিদে সমস্ত রেকর্ড ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে । কাউন্টি ক্রিকেট খেলেই সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠলেও হিকের প্রধান স্বপ্ন টেস্ট খেলা এবং ইংল্যাণ্ডের হয়ে । ১৯৮৪ থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন । সেখানকার নিয়মানুযায়ী, দশ বছরের আগে কেউ বাসিন্দার স্বীকৃতি পেতে পারে না । হিকের প্রতিভা দেখে তাঁর ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা হয়েছে । সাত বছর পর অর্থাৎ আগামী বছরই হিক ইংল্যাণ্ডের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছেন ।

সম্প্রতি হিকের ওপর একটি বই বেরিয়েছে লণ্ডন থেকে, নাম 'হিক অ্যাণ্ড ডিলি সার্কাস' । তাতে ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিক ব্যক্তিগত কিছু কথা জানিয়েছেন, তাঁর পছন্দসই শর্ট ফ্রন্ট ফুট ড্রাইভ । প্রিয় খেলোয়াড়, জিম্বাবোয়ে দলের ডানকান ফ্লেচার । প্রিয় স্বপ্ন, লর্ডস মাঠে শতরান করা । খুব সম্ভবত, আগামী মরসুমেই হিকের এই স্বপ্ন পূরণ হবে ।

গ্রেম হিকের একটি সংস্কার আছে ছেলেবেলা থেকেই, কোনও ব্যাটসম্যান আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার আগেই তিনি ক্রিজে হাজির হয়ে যান । তারপর কী করেন ? চোখে সর্ষেফুল দেখা বোলাররা বোধ হয় এর উত্তর দিতে পারবেন !

আর-একটা গোল হতে চলেছে !
এত সহজে নয় !
শাবাশ, নোয়েল ! খুব বাঁচিয়েছ !
ব্যাকস্টার বল বাইরে পাঠিয়েছে !
মর্টনের দফা রফা ! রয়ের কাণ্ডজ্ঞান থাকলে ওকে এবার তুলে নেবে !
মেলচেস্টারের বদলি গোলকিপারও ওর চেয়ে ঢের ভাল···
লাগেনি তো, টাবি ? বিশ্রীভাবে পড়ে গিয়েছিলে !
ওটা দুর্ঘটনা নয়, রয় ! আমাকে ফাউল করেছিল বলে পড়ে গিয়েছিলাম ! রেফারি দেখতে পায়নি !
রোভার্সের রয়
ডসনের সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলটা ধরে ফেলতেই ও আমার পাঁজরে গুঁতো মারে ! ব্যাপারটা আমাকে···
···খেপিয়ে দিয়েছে ! ওদের দেখিয়ে দেব কে বুড়ো ! এখন থেকে বল এখানে থামবে··· আমার গোলের সামনে !
মাঠে তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে···
আআক্ !
ঝোড়ো হাওয়ায় বল ব্ল্যাকি গ্রে-র মাথা টপকে চলে গেল !
এগিয়ে যাও, ডসন···
···দ্বিতীয় গোল পাবেই···

উউউহ্ ! মর্টনের ভাগ্য ভাল, বলটা এক মিটার ওদিক দিয়ে গেছে !
বেচারা বুড়ো বলটা দেখতেই পায়নি !
কিন্তু রয় ঠিক জানত···
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে টাবি বুঝতে পেরেছিল শট বাইরেই যাবে ! তাই ও ঝাঁপাবার চেষ্টাও করেনি ! আর জলদি···
···গোল-কিক করে বল আমাকে দিয়েছে ! ওর বুদ্ধিটা অন্তত আগের মতোই ধারালো আছে !
রয় !
উফ্ !
মাঠ যেন স্কেটিং রিঙ্ক, কিন্তু রয়ের ভারসাম্য প্রায় নিখুঁত ।
কী দৌড় !
এবং কী দুঃস্বপ্ন ! সত্যি-সত্যিই তুষার-ঝড় !
রয়, আমি এখানে !
রয় ডাকে সাড়া দিলে···
ধন্যবাদ, রয় রেসি !
সর্বনাশ ! আমি বিপক্ষকে বল পাস করছি···
তখন, জোরে বাঁশি বেজে উঠলে···
খেলা শেষ ! দুর্যোগের জন্য খেলা পরিত্যক্ত !
তোমরা ভাগ্যবান, মেলচেস্টার !
আমরা খেলায় জিতেই গিয়েছিলাম, বিশেষ করে টাবি মর্টন বোকার মতো গোলে খেলছিল বলে !
এটাই সম্ভবত রোভার্সের হয়ে ওর শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলা !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল 'মায়ে গেরি'

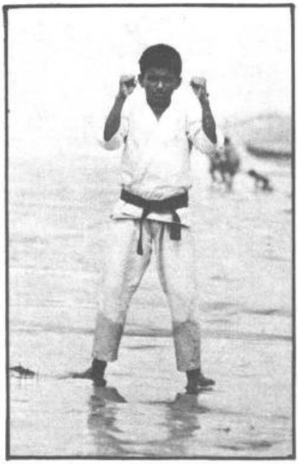

দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা জাপানি ভাষায় যাকে 'দাচি' বলে, তা নিয়ে আমি কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। আমি যে ভঙ্গিগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো ক্যারাটের শুরুতেই ব্যবহার হয়। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন রকমের দাঁড়ানোর ভঙ্গি আছে, যেগুলো ক্যারাটে শেখার পরের দিকে প্রয়োজন হয়। তাই এখন ওই ভঙ্গিগুলোর আলোচনা করলাম না। আমি এখন ক্যারাটের পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব। ক্যারাটে কথাটির অর্থ—খালি হাতে আত্মরক্ষার পদ্ধতি। আগেই বলেছি যে, ক্যারাটেতে শুধু হাতের ব্যবহার নয়, আত্মরক্ষার জন্য শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গই কাজে লাগে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল পা দিয়ে আঘাত করা বা আঘাত আটকানোর কৌশল। আমি পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার যে পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করব, তার জাপানি নাম 'মায়ে গেরি'।

মায়ে গেরি : এই কথাটার ইংরেজি অর্থ হল 'ফ্রন্ট কিক', অর্থাৎ সামনে পা দিয়ে সোজা আঘাত করার পদ্ধতি। 'মায়ে' কথাটির অর্থ সামনে, 'গেরি' কথাটির অর্থ পা দিয়ে আঘাত করা। কিওকুশিন ক্যারাটেতে দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো সবই ইওইদাচি থেকে শুরু করতে হবে। পা দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতিগুলো শুরুতে ইওইদাচি থেকেই অনুশীলন করতে হবে। প্রথমে ঠিকভাবে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর হাতদুটো মুঠো করে নীচ থেকে তুলে এনে কানের সমান উচ্চতায় মুখের সামনে রাখতে হবে। এইবার নিজের মুখটাকে হাত দুটো দিয়ে ঠিকমতো আড়াল করে পা দিয়ে মারার জন্য তৈরি হতে হবে। প্রথমে হাত দুটো ওপরে রেখে ডান পা-টাকে হাঁটু থেকে মুড়তে হবে এবং হাঁটু (ডান) যতটা সম্ভব ওপরে তুলে আনতে হবে, এই অবস্থায় পায়ের গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা নীচের দিকে নামিয়ে টানটান করে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে পায়ের আঙুলগুলো ওপর দিকে তুলে রাখতে হবে। এইবার শরীরের ওপর ভাগ পেছনের দিকে একটু হেলিয়ে (কিন্তু মাথা সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে হবে এবং কখনওই পেছনে বেশি হেলে যাওয়া ঠিক নয়) শরীরের ভারসাম্য বাঁ পায়ের ওপর ঠিক রেখে বাঁ পা হাঁটু থেকে একটু মুড়ে মাটিতে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। এইবার ডান পা সোজা সামনের দিকে প্রতিপক্ষের থুতনি বা চিবুক লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে। সেইসঙ্গে ডান হাতটা ওপর (মুখের সামনে) থেকে নীচে নেমে আসবে শরীরের পাশ দিয়ে। ডান পা দিয়ে মারা হয়ে গেলে আবার ডান পা শুরুর মতো হাঁটু থেকে মুড়ে মাটিতে নেমে আসবে। সেইসঙ্গে ডান হাতটা আবার ওপরে উঠে আসবে। ডান পা দিয়ে মারা হয়ে গেলে সব ব্যাপারটা একইভাবে ঠিক রেখে বাঁ পা দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে একবার ডান তারপর বাঁ, প্রতি পায়ে শুরুতে ১৫-২০ বার এবং পরে আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে ৫০ বার করে অনুশীলন করতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন হাঁটুতে ঝটকা না লাগে।

ফোটো : উৎপল সরকার

ভারত চলতি সিরিজে লর্ডস্ টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছে ঠিক কথা, কিন্তু কপিলদেব একটি চমকপ্রদ রেকর্ডও করেছেন । ওই ঐতিহাসিক মাঠে, যা একেবারে তাঁর খেলার সঙ্গে মানানসই । ফলো-অন বাঁচানোর মুখে অকুতোভয়ে কপিল এডি হেমিংসের ওভারের শেষ চারটি বলে যেভাবে বিশাল চারটি ছক্কা হাঁকান, তা এককথায় অসম্ভব, অবিশ্বাস্য । টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এ-রেকর্ড আর কারও নেই—পর পর চার বলে চারটি ছক্কা ।

কপিল যখন এই ছক্কা হাঁকড়াতে শুরু করেন, তখন লর্ডস্ মাঠে এক মজার কাণ্ড ঘটে । বি বি সি-র অতিথি ভাষ্যকার ছিলেন ভারতের অতীতের আর-এক মারকুটে ব্যাটসম্যান ফারুক ইঞ্জিনিয়ার । দুটি ছক্কা দেখার পর ফারুককে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, পরের বলটি কপিল কীভাবে খেলবেন ? ফারুক জবাব দেন, কপিল অবশ্যই এক রান নিয়ে শেষ বলটি অনভিজ্ঞ হিরওয়ানিকে খেলতে দেবেন, যাতে পরের ওভারটি কপিল নিজে খেলতে পারেন । কেননা তখনও ভারতের ফলো-অন বাঁচানো যায়নি এবং হাতেও আর উইকেট নেই । ফারুকের কথা শেষ হওয়ার আগেই কপিল তৃতীয় ছক্কাটি মেরেছেন । শেষ বলেও ফারুক একই ধরনের মন্তব্য করলেন । এবং আবারও ছক্কা, সোজা লং-অন-এর ওপর দিয়ে । ওই ছক্কার সুবাদেই ভারত ফলো-অন বাঁচায় । এই চার ছক্কার পর ফারুকের মন্তব্য জানা যায়নি, তবে কপিলকে নিয়ে মন্তব্য করা যে সহজ নয়, এটা নিশ্চয়ই তিনি বুঝেছেন । ফর্মে থাকা কপিলদেবের সত্যিই কোনও তুলনা নেই ।

টেস্টে রেকর্ড গড়লেন কপিল । প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে এক ওভারে সর্বাধিক ছক্কা মারার রেকর্ড কার ? এক ইনিংসেই বা কে মেরেছেন সর্বাধিক ছক্কা ? এক ওভারে সর্বাধিক ছক্কা মারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক কিংবদন্তির নাম—সার গারফিল্ড সোবার্স । ১৯৬৮ সালের ৩১ অগস্ট । সোয়ানসির সেইন্ট হেলেনস-এ নটিংহামশায়ার বনাম গ্ল্যামারগনের খেলা চলছে । ম্যাচের প্রথম দিন । চা পানের বিরতির আর মিনিট দশেক বাকি । ব্যাট করছেন নটিংহামশায়ার দলের অধিনায়ক সোবার্স । বল হাতে গ্যারির মুখোমুখি ২৩ বছর বয়সী বাঁ হাতি মিডিয়াম পেসার ম্যালকম ন্যাস । স্পিনও করাতেন তিনি । প্রথম দুটি বল লেগের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে গেল, তৃতীয়টি একটি রাজসিক পুলের ছক্কা । চতুর্থটি আবার লেগের ওপর দিয়ে, পরেরটি লং-অফের মাথার ওপর দিয়ে । পর পর পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা—অবিশ্বাস্য রেকর্ডের উত্তেজনায় মাঠ কাঁপছে থরথর করে । রাগে ন্যাস শেষ বলটি দিলেন বাউন্সার । দুরন্ত হুক করলেন সোবার্স এবং ছক্কা । মজার ব্যাপার, বলটি গিয়ে পড়েছিল এক বাগানে এবং বলটি হারিয়ে যায় । পরের দিন এক স্কুল-ছাত্র অবশ্য বলটি উদ্ধার করে ।

গ্যারি সোবার্স

ছক্কার ছড়াছড়ি

টেস্টে এক ওভারে পর পর চার বলে ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ড করেছেন কপিলদেব । প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে এক ওভারে, এক ইনিংসে, এক ম্যাচে এবং এক মরসুমে ছক্কা মারার রেকর্ড কাদের দখলে ? আলোচনা করেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

এক ইনিংসে সর্বাধিক ছয়

১৫টা	জন রিড (১৯৬৩ সালে)
১৩টা	মজিদ খান (১৯৬৭ সালে)
১৩ টা	গর্ডন গ্রিনিজ (১৯৭৪ সালে)
১৩টা	জি· হামপেইজ (১৯৮২ সালে)
১২টা	গুলফ্রাজ খান (১৯৭৭ সালে)

এক ওভারে সর্বাধিক ছয়

৬টা	গ্যারি সোবার্স (১৯৬৮ সালে)
৬টা	রবি শাস্ত্রী (১৯৮৬ সালে)
৫টা	এফ· হেউস (১৯৭৭ সালে)
৫টা	টি· জেস্টি (১৯৮৪ সালে)

পর পর ছ' বলে ছ'টি ছক্কা মারার রেকর্ড আছে গ্লস্টারশায়ারের মাইক প্রোকটরেরও । তবে এক ওভারে নয়, দু' ওভারে । প্রথম ওভারের শেষ দুটি বলে এবং তৃতীয় ওভারের প্রথম চারটি বলে । মধ্যের দ্বিতীয় ওভারটি তিনি খেলেননি ।

কুড়ি বছর পর সোবার্সের রেকর্ডটি কিন্তু স্পর্শ করেন ভারতের রবি শাস্ত্রী । ১৯৮৬-এর ১০ জানুয়ারি বম্বে বনাম বরোদার রনজি ট্রোফির ম্যাচে বরোদার বাঁ হাতি স্পিনার তিলকরাজের

কপিল দেব

এক দিনের ক্রিকেটের বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতা হয় ইংল্যান্ডে। কে কত ছক্কা মারতে পারেন, তা নিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় এইসব প্রতিযোগিতায়। সেরা পুরস্কারটি দখল করার জন্য একসময় জোর প্রতিযোগিতা চলত ভিভ রিচার্ড্‌স ও ইয়ান বথামের মধ্যে। কখনও রিচার্ড্‌স জিততেন, কখনও জিততেন বথাম।

রবি শাস্ত্রী

এক ওভারে পর পর ছ'টি ছয় মারেন রবি—তিনটি মিড অন, দুটি সাইড স্ক্রিনের ওপর দিয়ে এবং একটি স্কোয়ার লেগের পাশ দিয়ে মাঠ টপকে চলে যায়। রবি রেকর্ড করে জানান শেষ ছক্কাটি তাঁর জীবনের সেরা শিহরনজাগানো শট। আসলে এটি কীর্তির, রেকর্ড করার শিহরন নিশ্চয়ই।

ওভারে নয়, এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা মেরেছেন নিউজিল্যান্ডের জন রিড। পনেরোটি ছক্কা মারেন তিনি ১৯৬৩-তে, ওয়েলিংটনে, প্লাংকেট শিল্ডের একটি ম্যাচে। ওয়েলিংটন দলের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস-এর বিপক্ষে ওই নজির গড়েন তিনি। ২৯৬ রান করেন রিড, এর মধ্যে ছিল ১৫টি ওভার বাউন্ডারি এবং ৩৫টি বাউন্ডারি অর্থাৎ ২৩০ রানই আসে মাঠের বাইরে থেকে।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দু' ইনিংস মিলিয়ে মোট

ভিভ রিচার্ড্‌স

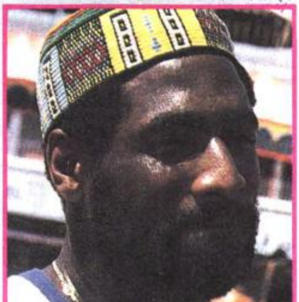

ইয়ান বথাম

১৭টি ছক্কা মারার রেকর্ড আছে ওয়ারউইকশায়ারের জিম স্টুয়ার্টের, ১৯৫৯-এ ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে, ব্ল্যাকপুলের স্ট্যানলি পার্ক-এ।

ছক্কা মারার ব্যাপারে পিছিয়ে নেই পৃথিবীর অন্যতম সেরা মারকুটে ব্যাটসম্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ড্‌স। টেস্টে তিনি অসংখ্য ছয় মেরেছেন, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বেশি হয় কাউন্টি ক্রিকেটে তাঁর বন্ধু ইয়ান বথামের সঙ্গে। দুজনেই একসময় একসঙ্গে সমারসেটে খেলতেন। বথাম একটি ছক্কা হাঁকালে, রিচার্ড্‌স দুটি মারেন। রিচার্ড্‌সের মারা বল মাঠের বাইরে দাঁড় করানো কত গাড়ির কাচ যে ভেঙেছে, তার ইয়ত্তা নেই। একবার রিচার্ড্‌সের একটি ছক্কা কাছের এক বাড়ির বাথরুমের জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। রিচার্ড্‌স তাঁর বন্ধু বথামকে মজা করে বলেছিলেন, "কেউ আমাকে কিছু বলতে এলে, আমি বলব এই ছক্কাটা আমি মারিনি, তুমি অন্যরকম একটা রেকর্ড করবে বলে মেরেছ।"

রেকর্ড নয়, সেরা রোমাঞ্চকর ছক্কাটি মেরেছেন বোধ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকট। ১৯৫৩-৫৪ সিরিজে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট ম্যাচ চলছে। বোলার অ্যালান মস। ব্যাটসম্যান ওয়ালকট ওভারপিচ বলটা সপাটে ড্রাইভ করলেন। মসের কানের পাশ দিয়ে বলটা বুলেটের গতিতে বেরিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে কংক্রিট সাইট স্ক্রিনে আঘাত করে ফিরে এল মসের পায়ের কাছে। পুরো ঘটনাটা বুঝতে আম্পায়ারের বেশ সময় লেগেছিল।

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য, সন্দীপ শঙ্কর ও উৎপল সরকার

ULKA 13145-BEN

ধনী খেলোয়াড়

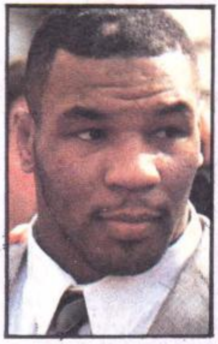

এখন বিশ্বে সবচেয়ে ধনী খেলোয়াড় কে ? যাঁরা লেন্ডল, বেকার বা মারাদোনার মতো টেনিস বা ফুটবল স্টারদের কথা ভাবছেন, তাঁরা ভুল করছেন । সবচেয়ে ধনী এখন মাইক টাইসন, ঘুসির জোরে তাঁর বাৎসরিক আয় আনুমানিক ৪৭ কোটি টাকা । দ্বিতীয়ও একজন মুষ্টিযোদ্ধা—জেমস বাস্টার ডগলাস, আয় ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, তৃতীয় স্থানটিও মুষ্টিযোদ্ধারই, সুগার রে লিওনার্ডের, ২২ কোটি টাকা । বাৎসরিক আয়ের দিক দিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম হলেন রেসিং ড্রাইভার আয়ারটন সেনা ও অ্যালেন । ষষ্ঠ গলফার জ্যাক নিলকস (৮০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা), সপ্তমে গ্রেগ নরম্যান (৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা), অষ্টম স্থানে আছেন বাস্কেটবল তারকা মাইকেল জর্ডন এবং নরম্যান হোয়াইন, নবম গল্ফার পামার । দশ নম্বরে আর-এক মুষ্টিযোদ্ধা হোলিফিল্ড । বরিস বেকারের স্থান একাদশে । বার্ষিক আয় ৭০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । স্টেফি গ্রাফ আছেন তেরো নম্বরে, বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা । আয়ের এই তালিকাটি প্রকাশ করেছে ফোর্ডস ম্যাগাজিন । আর একটিই খবর, ধনীদের তালিকায় প্রথম তিরিশজনের মধ্যে নাম নেই ফুটবলের যুবরাজ মারাদোনার ।

আবার গাওস্কর

'সুনীল গাওস্কর প্রেজেন্ট্স' নামে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটির কথা মনে আছে ? তাঁর খেলার মতোই টিভি-র এই প্রোগ্রামটি দারুণ ঝকঝকে ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল । বি.বি.সি-র অতিথি ভাষ্যকার হিসেবে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ কভার করার ফাঁকে-ফাঁকে গাওস্কর সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় প্রোগ্রামটিও ক্যাসেটবন্দী করে নিলেন । নব্বই মিনিটের এই ভিডিও ক্যাসেটটি একদিনের ম্যাচ নিয়ে । নাম, 'উইনার্স অল—দ্য বেস্ট অব ওয়ান ডে ক্রিকেট' । এটি নেওয়া হয়েছে এ.বি.সি, বি.বি.সি, চ্যানেল নাইন, টি ভি এন জেড প্রভৃতি সংস্থার বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে । এটির বিশেষত্ব এর একটি অংশও ইতিপূর্বে ভারতে দেখা যায়নি । এতে আছে ১৯৭১ সালে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের অংশবিশেষ, আছে প্রুডেনশিয়াল কাপ, বিশ্বকাপ, প্যাকার ম্যাচ, শারজা কাপ সহ প্রত্যেকটি সেরা ম্যাচের নির্বাচিত আকর্ষক অংশ । এই ক্যাসেটটি এখনই দেখতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখের কথা, আপাতত টিভিতে দূরে থাক, ভারতেই ক্যাসেটটি পাওয়া যাবে না । কপিরাইট যে সংস্থার, তাঁরা অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যেই এটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ।

প্রতিভার অকালমৃত্যু

প্রাক্তন বক্সিং হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান লিয়ান স্পিঙ্কস-এর তিন ছেলে। বড় ক্যালভিন। তার বয়স ১৯। মেজো ডারেল। তার বয়স ১৭। ছোট ছেলের নাম কর্‌রে। তার বয়স ১২। এরা তিনজনই বক্সার। সবচেয়ে ভাল লড়ে ডারেল। কর্‌রে সবে অপেশাদার বক্সিং শুরু করেছে। কিন্তু দুঃখের কথা, ক্যালভিন দুটি পেশাদার লড়াইয়ে জিতে তৃতীয় লড়াইয়ে নামার আগেই আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে। মিসিসিপি সেতু দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ক্যালভিন। তখনই তাকে গুলি করা হয়। আমরা হয়তো আগামী দিনের এক চ্যাম্পিয়ানকে হারালাম। ক্যালভিনের প্রশিক্ষক চার্লস হ্যাম বলেছিলেন, "ক্যালভিনের লড়াই করার ক্ষমতা অসাধারণ। দুটি হাতেই সে ঘুসি চালায়। তবে ওকে একটু রক্ষণাত্মক হতে হবে, সেইসঙ্গে নক-আউট পাঞ্চও শিখতে হবে।" হ্যাম অনেক কিছু আশা করেছিলেন ক্যালভিনের কাছে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হল না। দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়ে ক্যালভিন চলে গেলেন

কার্ল লিউইসের আত্মজীবনী

সম্প্রতি কার্ল লিউইসের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। সহলেখক জেফ্‌রি মার্কস। লিউইস নিজের কথা বলেছেন, আর তা লিখেছেন মার্কস। এই ধরনের বইগুলি এভাবেই নাকি লেখা হয়। বইটিতে লিউইস নিজের কথা যতটা না বলেছেন, তার চেয়েও বেশি বলেছেন তাঁর প্রতি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। দুটি ওলিম্পিকে ছ'টি সোনা পেয়েছেন লিউইস। যেরকম সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি দৌড়ন, ঠিক সেই অনায়াস ভঙ্গিতেই জবাব দিয়েছেন নানা বিতর্কের। কার্লের ধারণা, অনেকে তাঁকে অপছন্দ করে। এর মূলে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই দায়ী। কার্ল বলেছেন, "আমার সম্বন্ধে নতুন কিছুই লেখার ছিল না। তাই যখন নতুন কিছু থাকে না, ওরা খারাপ কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করে।" ভারী সুন্দর-সুন্দর কথা লিখেছেন লিউইস। ১৯৮৮ সালে ওলিম্পিক ট্রায়ালে জো ডিলোচ-এর কাছে হেরে যাওয়ার পর তিনি তাঁর পার্টনারকে বলেছিলেন, "নড়তে-চড়তে থাকো, হাসো। যদি কোনও চেনা লোকের সামনে পড়ো তো তার দিকে দৃষ্টি দাও। তখনই লোকে তোমায় দেখবে ও ভাববে, তুমি কত ভাল।"

খরচ লাখ-লাখ ডলার

সারা বিশ্বে গলফ খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমেরিকায় তা সর্বাধিক। গত বছর ২৯০টি গলফ কোর্স চালু হয়েছে সেখানে। এ বছর হবে প্রায় ৩০০টি। ন্যাশনাল গলফ ফাউন্ডেশন প্রতি বছর ৪০০টি নতুন কোর্স তৈরি করতে চায়। এক-একটি কোর্স করতে যা খরচ পড়ছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। টম কাজিও নামে এক স্থপতি লা ভেগাস-এর উত্তরে একটি আধা মরুভূমিতে তৈরি করেছেন এরকমই এক গলফ কোর্স। ৩০ লক্ষ ডলার খরচ হয়েছে জল ও বিদ্যুতের জন্য। ৬০ ফুট গভীর সব গর্ত খোঁড়া হয়েছে। ৩০ লক্ষ কিউবিক গজ মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে ঢিবি ও ছোট-ছোট পাহাড়। বড়-বড় পাথরের চাঁই ট্রাকে করে আনা হয়েছে দূর থেকে। পুকুর, এমনকী জলপ্রপাতও তৈরি করা হয়েছে। ১০,০০০ গাছ আনা হয়েছে, যা পুঁততে খরচ হয়েছে ৯০ লক্ষ ডলার। সবশেষে গোটা কোর্সটিকে মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢাকা হয়েছে, যাতে মরুভূমির হাওয়া কোর্সটির কোনওরকম ক্ষতি করতে না পারে। এর জন্যও খরচ আরও ৪০ লক্ষ ডলার। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৭০ লক্ষ ডলার! এখানেই শেষ নয়। জাপানে এরকমই এক গলফ কোর্স করতে খরচ হয়েছে প্রায় ২৬ কোটি ডলার।

অভিনব রেস

আগামী নভেম্বরে এক অভিনব কার-রেস অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ায়, উত্তরের ডারউইন থেকে দক্ষিণের অ্যাডিলেড পর্যন্ত তিন হাজার কিলোমিটারের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে ১০টি দেশের ৪৩টি গাড়ি। প্রতিযোগিতাটি অভিনব, কারণ গাড়িগুলোর একটিতেও তেল বলে কিছু থাকবে না। গাড়িগুলো দৌড়বে সৌরশক্তিতে, তাই এই রেসের নাম : সান-পাওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড সোলার চ্যালেঞ্জ। গাড়িগুলোও অন্য ধরনের, লম্বায় ছ' মিটার, চওড়ায় দু' মিটারের বেশি নয়। ছুটবে কিন্তু কম জোরে নয়, ঘন্টায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার। এই অভিনব রেস অবশ্য প্রথম হচ্ছে না, এর আগে হয়েছে ১৯৮৭-তে, আমেরিকায়।

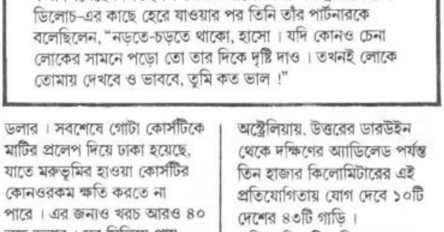

বেন আবার

এই সেপ্টেম্বরেই বেন জনসনের দু' বছরের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে। কানাডার ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, বেন এবার দেশের হয়ে দৌড়ে নামতে পারবেন। বেন নিজেও দারুণ আগ্রহী। বলেছেন, "আমি সাগ্রহে তাকিয়ে আছি ১৯৯২-এর

বার্সিলোনা ওলিম্পিকের দিকে। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে, ড্রাগ ছাড়াও আমিই সেরা, দ্রুততম পুরুষ।" অত্যুৎসাহী অনেকেই চেষ্টা করছেন সেই পরীক্ষাটা এখনই করতে, কার্ল লিউইস না বেন কে সেরা, তা এখনই প্রমাণ হয়ে যাক।

মার্টিনার ইচ্ছা

আগামী বছর মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা যখন উইম্বলডনে খেলতে যাবেন, তখন তাঁর সামনে থাকবে উইম্বলডনে ১০০টি ম্যাচ জেতার হাতছানি। এখন পর্যন্ত ওই প্রতিযোগিতায় মার্টিনা জিতেছেন মোট ৯৯টি ম্যাচ। ন'বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান মার্টিনা বলেছেন, উইম্বলডন জেতার চেয়ে এখন আমি ওই শততম ম্যাচটি জেতার স্বপ্নই দেখছি।

সম্পূর্ণ উপন্যাস
ইস্কুলের ছুটি
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে, উঠোনে পা দিতে গিয়ে দিপুর মনে হল, পাকা ধান-খড়ের গন্ধের সঙ্গে ইস্কুল ছুটি হওয়ার গন্ধও মিশে আছে।

সারাদিন ক্লাসে আটক থাকাটা যে কী দুঃখের, তা যে আটক থাকে সে বোঝে। ছুটি হলে সারা মাঠ তাকে খেলতে ডাকে, পাশের ছোট শালবন ঘুরে বেড়াতে ডাকে, বাড়ি ফেরার রাস্তাটাও তাকে ডাকে। বলে, "এই দিপু, ঘর যাবি না ?" দিপু জানে, ছুটি মানেই আলো, মাঠ আর আকাশের জগতে দেদার পৌঁছে যাওয়া। বোর্ডিং থেকে বাড়ি এসে উঠোনে পা দিতে গিয়ে তাই দিপুর এত আনন্দ !

অবশ্য উঠোন এখন খামারবাড়ি। চারদিকে বড়-বড় ধানের গাদি। অনেক বিঘের ধান উঠেছে। আরও উঠবে, মহাদেবদা বলেছিল। মহাদেব বৈরাগী, দাদুর আমলের লোক। জমি-জায়গা, খেতখামার—সব সে জানে, বাবাও যা জানেন না। সে বলেছিল, "জানিস দিপু, শুধু এই খামারে তিনশো বিঘে জমির ধান উঠত। এখন আর কী দেখছিস !"

দিপু উঠোন দিয়ে মহাদেবদার কাছেই যাচ্ছিল। আজ সে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। এসে মা'র ঘরে বইপত্তর রেখেছে। হলই বা ক্লাস ফাইভ, তাই বলে বইপত্তর তো কম নয় ! তারপর ঠাকুমার ঘরে গেছে। তাকে দেখে তো বুড়ির চোখে জল ! উঠতে পারেন না বিছানা থেকে। তাই বোধ হয় এই কান্না। সেখান থেকে দুধ-মুড়ি খেয়ে মহাদেবদার কাছে যাবে বলে উঠোন দিয়ে যাচ্ছিল।

তখনই ধান আর খড়ের গন্ধটা পেল। শহরের ইস্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকার জন্য সে ভুলেই গিয়েছিল, "এখন মাঠ থেকে পাকা ধান উঠছে। শুধু থাকছে খেসারি।"

দিপু হঠাৎ থামল। ভয়ে-ভয়ে একবার পেছনে তাকাল। কেউ আসছে নাকি ? তারপর হাসল একটু। দুর ! কী বোকা সে ! নিজের পায়ের শব্দে নিজেই ভয় পাচ্ছে ! তা পাবেই তো ! একদিন রাত্রে মহাদেবদা গল্প করতে-করতে বলেছিল, "দিপু রে, একা-একা তুই যখনই যেখানে যাবি, জানবি, তোর পেছনে-পেছনে আরও একজন কেউ যাচ্ছে।"

মহাদেবদা গল্পের রাজা ! দিপু বলেছিল, "ছাই যাচ্ছে। কী যে বানিয়ে-বানিয়ে আবোল-তাবোল বলো না মহাদেবদা, তার মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই।"

তখন হ্যারিকেনের আলোয় মহাদেব বৈরাগীর ঘন লম্বা পাকা দাড়ির ছায়া পড়েছিল ছিটেবেড়ার ওপর। কোনও শব্দ না করে নিজের মনে হাসছিল মহাদেবদা। হাসছিল দেওয়ালের ছায়াও। তা হলে সে যখন একা-একা বাগানে যায় গুলতি নিয়ে বা শালবনের মধ্যে পাখি খোঁজে, তখনও কি কেউ এই ছায়ার মতো এমনই করে তার সঙ্গে থাকে ? সে কে ?

দিপু তখন সত্যি-সত্যি ভয় পেয়েছিল। মহাদেবদার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "আচ্ছা বেশ। তা সঙ্গে-সঙ্গে আর যদি কেউ হাঁটে, তবে তার পায়ের শব্দ হয় না কেন ? বলো ?"

মহাদেবদা হাসতে-হাসতে বলেছিল, "শব্দ হয় রে, হয়। তোর পায়ের শব্দের মধ্যে তার পায়ের শব্দগুলো লুকিয়ে থাকে। তাই তুই শুনতে পাস না। বুঝলি বোকারাম ?"

কথাগুলো এখন এই সন্ধের সময় খামারের ধান গাদিগুলোর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দিপুর মনে হচ্ছিল। হতেই, থমকে দাঁড়াল সে। দেখল, শীতের ছায়া-ছায়া অন্ধকারগুলোর সঙ্গে এই খামার, ওপারের বাগান, বা রাস্তার ওপারে শাল-জঙ্গল, সব, সব তাকে অবাক হয়ে দেখছে। আর ওপরের ওই মেঘলা আকাশটা ? সেও নিশ্চয়ই ! সব যেন ভূত এক-একটা !

এতে কার না ভয় করে ?

মহাদেবদা অবশ্য বলেছিল, "ভয় পাবি না রে দিপু, কক্ষনো ভয় পাবি না। তোর সঙ্গে যে চুপিচুপি হাঁটছে, সে তোর বন্ধু। আর কেউ নয়।"

কথাটা মনে আসতেই দিপু সাহস ফিরে পেল, যেন ভয়গুলো তক্ষুনি দূরে সরে দাঁড়াল তাকে ছেড়ে।

মা বারণ করেছিলেন। কাজের মেয়েটাও আসতে চেয়েছিল সঙ্গে। কিন্তু দিপু শোনেনি। মা কী করে জানবেন, মহাদেবদা কী মজার-মজার গল্প বলে। সঙ্গী অন্য কেউ থাকলে সে মজাটাই মাটি। আর মহাদেবদার গল্প তো সব তার নিজের। যাত্রার দলে ছিল তো এক সময়। কত দেশ বেড়ানোর গল্প, রাস্তায় দেখা-হওয়া, কত না-চেনা মানুষের গল্প, বনের ধারের ছোট নদীটার গল্প।

আসলে ভবঘুরে মহাদেবদা নিজেই একটা গল্পের ইয়া মোটা বই। ঠিক মহাভারতের মতো। তা ছাড়া, এ-ক'মাসে তার নিজের মনে যেসব গল্প গিজগিজ করছে, সেগুলো মহাদেবদা ছাড়া আর কাকে শোনাবে ? ঠাকুমাকে ? তিনি তো বিছানার সঙ্গে বিছানা হয়ে আছেন। বাবা, মা, কেউ যদি গল্পের কিছু বোঝেন ! তা ছাড়া বাবা

তো বাড়ি নেই। সেই মেদিনীপুরে।

আরে, কী একটা শব্দ হল যেন ? মেঘ ডাকল নাকি ?

হ্যাঁ, তাই তো। এই রে, বৃষ্টি আসছে।

দিপু দৌড় লাগাল। দূর থেকে চিৎকার করে ডাকল, "মহাদেবদা, তুমি কোথায় ? মহাদেবদা ?"

দূর থেকে মহাদেব সাড়া দিল, "এই তো বারান্দায়। দৌড়বি না, আস্তে-আস্তে আয়।"

হাট থেকে ফিরে মহাদেব বৈরাগী তার ছিটেবেড়ার ঘরের বারান্দায় বেঞ্চটার ওপর চুপচাপ বসে ছিল। বড্ড ক্লান্ত। বয়স যে সত্তর, হাটে যাওয়ার সময় সেই খেয়াল থাকে না। রাস্তা কম-সে-কম তিন ক্রোশ তো বটেই। যেতে-আসতে ছ' ক্রোশ।

দিপু এল। এক হাতে একটা চটি। অর্থাৎ, মাঝপথে দৌড়ঝাঁপের জন্য ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। তারপর দু'হাত দিয়ে মহাদেবদার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

মহাদেব হেসে বলল, "দৌড়ে আসতে না বললাম যে ? হোঁচট খেয়ে পড়েছিস তো ? কবে যে হাত-পা ভাঙবি ?"

দিপু কোনও উত্তর না দিয়ে তেমনই করে গলা জড়িয়ে পড়ে রইল। অনেকদিন পর মহাদেবদাকে কাছে পাওয়া ! মহাদেব বলে, "আরে ছাড়, ছাড়। এত জোরে গলা টিপে ধরলে মরে যাব যে রে।"

দিপু বলে, "হুঁ, মরে গেলেই হল। দাড়ি ধরে টেনে রাখব না ?"

মহাদেবের মনে হয়, তার বুড়ো শরীরে একটা তরতরে তাজা, দুষ্টু শরীরের উত্তাপ মিশে যাচ্ছে। সে উত্তাপটা কোথায় যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সত্তর থেকে শূন্যটা বেমালুম বেপাত্তা এখন। হাতে থাকছে মাত্র সাত।

মহাদেব দিপুকে বুকে টেনে নিয়ে হেসে বলে, "হ্যাঁ রে, ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলে দাড়ি ধরে টেনে রাখতে পারবি ?"

দিপু চেঁচিয়ে বলে, "পারব না মানে ? কই, কেউ ছাড়িয়ে নিক তো আমার হাত থেকে ? কত জোর দেখি ?"

"আচ্ছা, ডাক যদি আসে ?"

দিপু 'ডাক' কথাটা ঠিক ধরতে পারে না। তার মনে হয় ডাকাত ধরনের কিছু। বলে, "ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব না ?"

বলেই দিপু গলা ছেড়ে দিয়ে পাকা বক্সারের ভঙ্গি করে, খুব আস্তে মহাদেবের নাকে ঘুসি মারে।

মহাদেব হাসতে-হাসতে বলে, "তোর ইস্কুলে ঘুসি মারার 'কেলাস' হয় নাকি রে ? আগে তো কই এসব দেখিনি ?"

দিপু সোয়েটারটা নীচের দিকে টানে। মানে বেশ শীত করছে। বলে, "দুর, তা আবার হয় নাকি। একবার বোর্ডিংয়ের সবাই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখেছ মহাদেবদা ? তাতে এই ঘুসি মারামারি ছিল। উঃ, কী হাসির বই !"

মহাদেব এ-নাম কখনও শোনেনি। কর্তাবাবু যখন বেঁচে ছিলেন, তখন একবার তাকে ঝাড়গ্রামে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর-দেবতার ছবি। বলল, "না রে, দেখিনি। কর্তাবাবু তো এখন নেই। কে দেখাবে বল ?"

মহাদেব উঠে পড়ে। বলে, "তুই বোস। আমি হ্যারিকেনটা জ্বালি।"

তারপর আলোটা একটু নাড়া দিয়ে বলে, "তেলও নেই দেখছি। ভরতে হবে। দুষ্টুমি করিস না। চুপ করে বসে থাক।"

মহাদেব ঘরের ভেতর এসে ল্যাম্প জ্বালল।

বাইরে বসে চিমনিটা একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে মহাদেব ভাবে, কাজের মেয়েটা আদৌ কিছু দ্যাখে না। এই যে হ্যারিকেনে তেল নেই, চিমনিটা মোছা নেই ! বাজার থেকে এসে এসব কী ভাল লাগে ! আসলে কর্তাবাবু চলে যেতে এ-বাড়িতে তার দাম পড়ে গিয়েছে। কর্তাবাবুর আমলে লোকে তাকে কত খাতির করত। খাতিরের কারণ, সে কর্তাবাবুর পছন্দের লোক। মহাদেব বৈরাগীর কথা মানে, কর্তাবাবুর কথা। সে কথার নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। এখন কর্তাবাবুর ছেলে মালিক।

দিন বদলেছে, দিন বদলে যায়।

কাজেই মহাদেবকে লোকে খুব একটা গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া বউমাও ঠিক পছন্দ করেন না তাকে। তা না করুন। কর্তামা তো আছেন। মহাদেব তাঁকে বলে মা-ঠাকরুন। তিনি মহাদেবকে ছেলের মতো দেখেন। তবে তাঁরও যাওয়ার সময় এখন। প্রায়ই ভোগেন। বাত, হাঁপানি, হার্টের অসুখ।

কিন্তু এখনও তেজী, একরোখা। সবাই তাঁকে ভয় করে। তিনি যদ্দিন আছেন, মহাদেবও আছে। তারপর কী হবে কে জানে ! মা-ঠাকরুন যে কেন মহাদেবকে এত স্নেহ করেন, তা কেউ জানে না। গ্রামের লোকে বলে, মহাদেব মন্ত্র জানে। বুড়িকে তুক করেছে। তবে সব পেছনে, সামনে এখনও কেউ কিছু বলার সাহস করে না।

এ অঞ্চলের বড় পণ্ডিত এদের পুরোহিত, টোল আছে, তিনি হলেন পীতাম্বর সনবিগ্রাহী। তিনি তাঁর এক যজমানকে একদিন বলেছিলেন, "মন্ত্রটা কী জানো হে ?"

"আজ্ঞে না ঠাকুর।"

"মন্ত্রটা হল, মহাদেব লোকটা নির্লোভ। নামেও মহাদেব, কাজেও মহাদেব। এত বছর আছে জমিদার বাড়িতে। এত প্রতিপত্তি। কিন্তু দ্যাখোগে যাও, ভাঁড়ে মা ভবানী। আর দ্যাখো, দু' টাকা বেতনের গোমস্তা, তারও পাকাবাড়ি।"

মহাদেব এই মহাপাত্রদের বাড়িতে আছে প্রায় চল্লিশ বছর। তাই

একটা স্বত্ব জন্মে গিয়েছে। খোকাবাবু এখনও জমি-জায়গার সব ব্যাপার বোঝে না। অথচ মহাদেব বেশ বোঝে। জমিদারি চলে যাওয়ার পর কোন্‌টা দেবোত্তর, কোন্‌টা বেনামি, কোন্‌টা ভেস্ট, সব মহাদেবের নখদর্পণে। এটা হেলাফেলার ব্যাপার নয়। জমিজমা এখনও প্রচুর। মহাদেব দলিল, পরচা, খতিয়ান, চেক, এমনকী মামলার রায়ও টেনেটুনে বুঝে ফেলে। চেন দিয়ে জমিও মাপতে পারে আমিনের মতো।

কাজেই মহাদেবের খাতির কিছু কমলেও, দাম এখনও আছে। তবে কর্তাবাবু চলে যাওয়ার পর তার বড় একা-একা লাগে। আসলে সকলেরই মন চায় একজন দোসর, এই দোসর না হলে সে একা হয়ে পড়ে।

আবার একা না হলে, মন ঠাকুরের দিকে যেতে চায় না, যায় না।

এই হল দুনিয়ার বিপদ! কিন্তু চিমনিটার কালি ঠিক ভাল করে উঠছে না যে! মহাদেব চেষ্টা করে যায়।

সে ভাবে, এই যে কোথাও কেউ নেই, এটা একরকম ভাল ঠাকুর। সে যে কতদিন ঘরছাড়া! গ্রামের নাম ছিল চৈতন্যপুর, মেচেদায় নেমে উত্তরদিকে বৈষ্ণবচক পেরিয়ে আরও ক্রোশখানেক। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মহাদেব বৈরাগী ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। আশ্চর্য, মহাপ্রভু তার পদবির সঙ্গেই জীবনটাকে নামাবলীর মতো কেমন সুন্দর জড়িয়ে দিয়েছেন। পালাবার উপায় নেই। ইচ্ছে ছিল পায়ে হেঁটে পুরী পর্যন্ত চলে যাবে সে। তা দুঃখে না আনন্দে এই ঘরছাড়া, তা সে নিজেও জানে না। স্ত্রী চলে যেতে, একটা ঘরছাড়া আনন্দ, মুক্তির আনন্দ যে হয়নি তা নয়। হয়তো সব দুঃখের মধ্যে এক ধরনের আনন্দও মিশে থাকে। কে জানে!

বিষয়-আশয়? বিঘেখানেক ধানজমি, আর পান বরোজ। তা গানটা গলায় আসত ভালই। শখের যাত্রার দলে বিবেক সেজে গানও গেয়েছে মহাদেব। শিখেছিল কিছু। আর জানত কীর্তন, কয়েকটা বাউল গান। সে এখনও গাইতে পারে। কর্তাবাবু প্রায়ই এই গানটা শুনতে চাইতেন, 'আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।' এটা কার গান সে জানে না, গানটার প্রথম লাইনও এটা নয়। কিন্তু কবেকার শুনে-শুনে-শেখা বাউল গানটা তার মনে একেবারে গেঁথে আছে। প্রায়ই গুনগুন করে গায়। অর্থটা বোধ হয় এই, অচেনা মানে ঈশ্বর। আপনাকে, মানে নিজেকে চিনলে ঈশ্বরকেও চেনা যায়। বৃদ্ধ বয়সে এই অর্থটা স্পষ্ট হচ্ছে, ভোরবেলার কুয়াশা কেটে গেলে পৌষের ধানখেত যেমন স্পষ্ট হয়।

চিমনিটার কালো দাগটা উঠছে না। এক টুকরো সাবান বের করল সে। ঘরের ভেতরে, কখনও বাইরে দিপু একমনে গুনগুন করে গান করছে, বেড়াচ্ছে। খেয়াল নেই।

তা, ঘরছাড়া হয়েই ঘুরছিল মহাদেব। মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা পথের ধারের গাছতলায় বসত। তখন কেমন একটা ভাব আসত মনে। চারদিকটা নিঝুম। রোদ ওই দূরে মাঠের ওপারে শালবনের ধারে রি-রি করছে। মাথার ওপর সমুদ্রের মতো আকাশ। সে ভাবত, এই হল অচেনার জগৎ। নিজেকেই শুনিয়ে-শুনিয়ে হেসে বলত, "মহাদেব বৈরাগী, দ্যাখ, দু' চোখ ভরে দ্যাখ।"

হয়তো একটা নদী পড়ল পথে। মহাদেব দাঁড়াল। পিপাসা পায়নি, তবু আঁজলা ভরে জল খেল। হ্যাঁ, এ তো জল খাওয়া নয় গো! যেতে-যেতে নদীর সঙ্গে দুটো নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলে নেওয়া। কিন্তু আপদ হল, চলে যেতে গিয়ে। এ কী! নদীটা যে তাকে ডাকছে! আহা, পিছু ডাকতে নেই গো, পিছু ডাকতে নেই! পিছু ডাকলে আগের দিকে যাই কী করে ঠাকুর! কিন্তু নদী চোখে জল নিয়ে ডাকবেই!

উঠোনের বাগানে মৃদু আলো এসে পড়ল।

দিপু বলে, "এতক্ষণ লাগল হ্যারিকেন জ্বালতে? ও মহাদেবদা, এর মধ্যে ঘুমিয়ে নিলে একটু?"

মহাদেব বলল, "তেল ছিল না রে। কেরোসিনের বোতলটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। চিমনিটা মুছব, ন্যাকড়া কোথায়? সাবান কোথায়? বুঝলি না, এ যে ঘরছাড়া লোকের ঘর রে দিপু। সব আছে, আবার কিছু নেই!"

দিপু পা দোলাতে-দোলাতে এক সময় বলে, "মহাদেবদা তোমার, সেই লাউগাছটা কোথায়? বোর্ডিংয়ে যাওয়ার আগে দেখেছিলাম। মরে গেছে? দেখছি না তো?"

"না, ঠিক মরেনি।"

"তবে?"

"একটু বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। বেশি লাউ হত না। তা একদিন রাস্তার একটা ছাড়া গোরু হাঁ করে চেয়ে ছিল গাছটার দিকে। তাই পাতাসুদ্ধু কেটে ওকে দিয়ে দিলাম। নে খা, তোর ইচ্ছে হয়েছে যখন।"

দিপু হেসে বলে, "মহাদেবদা লাউগুলো লোককে দিয়ে দিতে। শেষকালে গাছটাও গোরুকে দিলে?"

দিপুর মুখে এই ধরনের কথা শুনে মজা লাগে তার। বলে, "জানিস? শ্রীকৃষ্ণ গোরু চরাতেন। এগুলো যে-সে জীব নয় রে দিপু। বুঝবি, বুঝবি, আমার মতো বুড়ো হবি যখন, তখন বুঝবি।"

শীতের অন্ধকারটা ঘন হয়। বেলপাহাড়ি থেকে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার শেষ বাসটা চলে গেল। শিশির পড়ে-পড়ে সড়কের লাল ধুলো থিতিয়ে আসছে। বেশ শীত করছে এখন।

দিপু বলল, "ঘরে চলো না মহাদেবদা?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মহাদেব বলল, "নে, চল।"

॥ ২ ॥

দিপু এসে মহাদেবের তক্তপোশটায় বসল।

মহাদেব বৈরাগী দেখছিল, দিপু এ ক' মাসে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। হয়তো বোর্ডিংয়ে নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকার জন্য। দেখতে বয়সের অনুপাতে লম্বা। ফরসা রং। তা মহাপাত্র-বাড়ির সকলেই ফরসা। গিন্নিমার বয়স ষাট। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ। এখন কিছুদিন রোগে ভুগে-ভুগে অবশ্য সে রূপ আর নেই। দিপুর চওড়া কপাল, ঠিক কর্তাবাবুর মতো। একমাথা ঘন চুল। একটা গোছা বেঁকে বাঁ দিকের কপালের কিছুটা অংশ ঢেকে দিয়েছে। সোজা নাক। ঘন পল্লবে ঢাকা চোখের পাতা। সে চোখে শুধু চঞ্চলতা নয়, যত রাজ্যের দুষ্টুমি ভিড় করে রয়েছে। বাঁ চোখের নীচে একটা কালো জড়ুল। এই জড়ুলটাই বোধ হয় ওর দুষ্টুমিগুলোকে বুদ্ধি জোগায়।

মহাদেব হ্যারিকেনটা নীচে সরিয়ে রাখল। বলল, "দিপু, তোর ইস্কুলে কী পড়ায় রে ? কবিতা পড়ায় ? কই, বল তো একটা কবিতা, শুনি।"

মহাদেব তার ঘরের বারান্দায় আসে। সামনে রাস্তায় আর মাঠে এখন অন্ধকার। শীত পড়েছে খুব। চারদিকটা থমথম করছে। তবে বাতাস বইছে না। পাতা ঝরে-যাওয়া নিমগাছটা কেমন যেন বড় একা! ঠিক তারই মতো! হাত তুলে আকাশকে কী যেন বলতে চাইছে!

মহাদেব ঘরে এসে দ্যাখে, দিপু বিছানায় শুয়ে পা নাচাচ্ছে। দুষ্টুমি! কেবল দুষ্টুমি ছেলেটার।

মহাদেব বলল, "বোর্ডিং থেকে এসে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করেছিস ?"

"হুঁ।"

"প্রণাম করেছিস ?"

"না তো।"

মহাদেব বলে, "অনেকদিন পরে বাড়ি এলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। তোর ইস্কুলে এসব শেখায় না ?"

দিপু বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাসে, "এ মা, মহাদেবদা কী যে বলে! আজকালকার ইস্কুলের কিচ্ছু জানে না।"

মহাদেব বলে, "কী করে জানব রে ? আমি কি তোর মতো বোর্ডিংয়ে থেকে কেলাস ফাইভে পড়ি ?"

এতক্ষণে দিপু মহাদেবের গায়ে-দেওয়া কাঁথাটা টেনে নেয়। মাঝে-মাঝে খুশিতে আবার পা নাচায়। আর এপাশ-ওপাশ করে। ওঃ, এক মুহূর্ত যদি স্থির থাকে ছেলেটা! একমাত্র গল্প শোনার সময় একদম চুপ। দু' চোখ বড়-বড় করে বলে, "মহাদেবদা, তারপর কী হল ?"

মহাদেব বলল, "কাঁথা মুড়ি দিয়ে যে শুয়ে পড়লি, পড়তে বসবি না ? মা বকবে যে ?"

দিপু কথাটা কানেই নেয় না। একটু পরে বলে, "ও মহাদেবদা, কবিতা শুনে তো তোমার চোখ ছানাবড়া। যদি গল্প শোনো, তা হলে যে কী করবে! আচ্ছা, আঙুর ফলগুলো টক—এ গল্প জানো ?"

"ওটা জানি।"

"আচ্ছা, আলিবাবা অ্যান্ড ফরটি রবার্স ?"

"সেটা আবার কী ?"

"আলিবাবা আর চল্লিশটা ডাকাত। চিচিং ফাঁক বলতে-না-বলতে পাথরের ইয়া ভারী দরজাটা খুলে গেল। আর তার মধ্যে···"

"ও, তাই বল। ওটাও জানি।"

"আচ্ছা, সে-ই 'লাউ গড়-গড় লাউ গড়-গড়' গল্পটা ?"

মহাদেব ভাবতে-ভাবতে বলে, "না, জানি না। কিন্তু তুই নিজে একটা গল্প বল তো ? দেখি, কী শিখেছিস ইস্কুলে গিয়ে ? আমি তোর গল্পই শুনব। অপরের লেখা গল্প নয়।"

দিপু খুশি হয়। সে বলে, "জানো মহাদেবদা, আমি বোর্ডিংয়ে একদিন বানিয়ে-বানিয়ে একটা গল্প বলেছিলাম। সেই যে গুলতি নিয়ে পাখি মারতে গিয়েছিলাম শাল-জঙ্গলে, সেদিন কী সুন্দর একটা পাখি দেখেছিলাম। গুলতি মারতে গিয়েও মারিনি। না, থাক। পাখিটার মা-বাবা যদি কাঁদে ? কী, ঠিক করিনি মহাদেবদা ?"

মহাদেব খুশি হয়ে বলে, "ঠিক করেছিস। কোনও সুন্দর জিনিস নষ্ট করতে নেই। ফুল ছিঁড়তে নেই, পাখি মারতে নেই। ভগবানের জিনিস, তুই নষ্ট করবি কেন ? আর ফুল তো ভগবানের সবচেয়ে আদরের জিনিস। তা, তোর গল্পটা বল ?"

দিপু লজ্জায় কাঁথাটা মুখের ওপর টেনে দেয়।

মহাদেব বলে, "লজ্জা কী! বল, শুনি।"

"দুর, ভাল হয়নি।"

মহাদেব হাসতে-হাসতে বলে, "খারাপটাই শুনব। তোর শেষ হলে আমার একটা গল্প বলব। নে, শুরু কর। আমি ততক্ষণে দুটো মুড়ি খাই।"

দিপু মুখ থেকে কাঁথাটা সরায়। একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "আচ্ছা শোনো। অনেক দূরে, এই মনে করো বেলপাহাড়ির কাছে, ছোট-ছোট পাহাড়ের ধারে, একটা বিরাট শালগাছ ছিল। কী ঘন পাতা, আর কী সবুজ। তার পাশেই একটা বড় কুর্চিগাছ। তা যখন সেই শালগাছে ফুল ফুটত, তখন কোত্থেকে একটা খুব সুন্দর পাখি এসে বসত। থাকত সেই গাছে।

দিপু থামল।

মহাদেব একটু অবাক হয়ে বলল, "বেশ ভাল হচ্ছে রে। থামলি কেন ? বলে যা।"

দিপু বলল, "জানো মহাদেবদা, এক-আধ বছর নয়, প্রতিবছর সেই পাখিটা আসত, প্রতিবছর।"

"পাখিটা দেখতে কেমন, সেটা আগে বল ?"

"দেখতে নীল, ঠোঁট দুটো কালো, লম্বা লেজ । এসে ডালায় বসত, শব্দ করত । মানে, মনের আনন্দে গান করত । আর সে গান শুনত সেই ছোট-ছোট পাহাড়, এলোমেলো বন । আর শালগাছটা সে গান শুনে আরও থোকা-থোকা ফুল ফোটাত । তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে । তার পাশে ওই যে কুর্চিফুলের গাছটা ছিল··· । আচ্ছা মহাদেবদা, তুমি কুর্চিগাছ চেনো ?"

"কেন চিনব না ! এইদিকেই তো অনেক । রাস্তার ধারে, জঙ্গলে । তুই মহাদেব বৈরাগীকে গাছ চেনাবি ? গাছ তো আমার বন্ধু । এ-অঞ্চলের সব গাছের নাড়িনক্ষত্রও চিনি রে । সে যাক । তারপর কী হল বল ?"

দিপু বলে, "একদিন কুর্চিফুলের গাছটা বলল,' ভাই শালগাছ, ওই পাখিটার নাম কী ?'

"শালগাছ একটু ভেবে-ভেবে বলল, 'নাম ? তা, নাম তো জানি না । ফুল ফোটার সময় আসে, থাকে । ওকে আমার খুব ভাল লাগে ভাই । কিন্তু নামটা তো···"

"কুর্চি হেসে বলে, 'প্রতিবছর আসে, তবু নামটাও জিজ্ঞেস করোনি ? এ কী গো ? তা তোমার বয়স কত হল ভাই শালগাছ ? বুড়ো হলে মন ভুলো হয়ে যায় কিনা !'

"'আট কুড়ি বছর কবে পেরিয়ে গিয়েছে । তখন ও-ই যে দূরে গ্রাম দেখছ, ওগুলো ছিল না । এই মাটির রাস্তাও না । তা, তোমার বয়স কত হল ভাই কুর্চি ?'

"'তোমার চেয়ে আমি ছোট । আমার বয়স এই ছ' কুড়ি হবে । তোমাকে পেন্নাম শালগাছ ভাই । তা সেই নীল পাখিটা কঁদ্দিন হল আসছে ?'

"'হ্যাঁ, বছর দশেক তো বটেই ।'

"'ছি, ছি, অ্যাদ্দিন আসছে,নামটাও জেনে নাওনি ? কী বোকা গো তুমি ?'

"শালগাছ একটু মন খারাপ করে বলে, 'পাখিটা কি ইস্কুলে পড়ে ? বোর্ডিংয়ে থাকে ? নাম, বাবার নাম, সব শিখে রাখবে ? তা তোমার এত আগ্রহ কেন ?'

"'না, এমনই, পাখিটাকে আমারও ভাল লাগে । আমার কাছে তো আসে না !'

"'তোমার ফুল কি বসন্তকালে ফোটে যে আসবে ?'

"'হ্যাঁ ভাই, তা অবশ্য ঠিক ।"'

মহাদেব বলল, "আরে, পাখিটার কী হল সেটাই বল ?"

দিপু বলে, "একদিন এক আদিবাসী দেখতে পেয়ে গেল পাখিটাকে । জানো ? তার লোভ হল । এ-পাখির মাংস নাকি খুব ভাল । সে তীর মেরে বসল পাখিটাকে । ছটফট করতে-করতে মরে নীচে পড়ে গেল পাখিটা । শালগাছ, কুর্চিগাছ, বুনো গাছপালা, ঘাস—সবাই থ হয়ে দেখল । আহা ! মেরে ফেলল পাখিটাকে !"

মহাদেব করুণ গলায় বলে, "আমারও কষ্ট হচ্ছে রে, দিপু ।"

দিপু বলল, "আমারও কী কম কষ্ট হচ্ছিল মহাদেবদা । পাখি মারলে কষ্ট হয় বলেই তো সেদিন গুলতি দিয়ে মারিনি । তা শোনো, এদিকে শালগাছের কী কান্না । কী কান্না ! পাখিটা যেন তার মেয়ে । কাঁদতে-কাঁদতে তার ডালপালা দিনে-দিনে কেমন শুকিয়ে আসতে লাগল । পাতাগুলো নেতিয়ে পড়েছিল আগেই । সে বছর আর গাছটায় বেশি ফুল হল না ।"

"তারপর ?"

"তারপর এক সময় শালগাছটার সব পাতা ঝরে গেল, ডালপালা শুকিয়ে গেল । কুর্চিগাছটা সব লক্ষ করছিল । একদিন ডেকে বলল, 'ও ভাই শালগাছ, দুঃখ করে আর কী করবে ? মানুষগুলো বড় নিষ্ঠুর । ওরা সুন্দর কিছু—সে পাখি, ফুল, গাছ—যাই হোক, সহ্য করতে পারে না । বড্ড হিংসুটে । তুমি ভাই ভাল হয়ে ওঠো ।'

"'আর ভাল হওয়া ! সে আর এ-জীবনে হবে না । আমি মরে যাব ।"'

দিপু একটু থামে । কী যেন ভাবে । তারপর বলে, "জানো মহাদেবদা, গাছটা মরে গেল । একদিন ক'জন আদিবাসী এসে করাত দিয়ে কেটে নিয়ে গেল সেটা । জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল । তখন, কুর্চিগাছটা একেবারে একা হয়ে যায় । চারপাশে কোথাও কেউ নেই । শুধু কয়েকটা ছোট-ছোট গাছপালা । ওগুলো কুর্চিগাছের দুঃখ বুঝতে পারে না । ওপরে যে নীল আকাশ, আর বেলপাহাড়ির ছোট-ছোট পাহাড়, শুধু চুপ করে দূর থেকে দ্যাখে । ওই যে পাশের ঝিরঝিরে ছোট্ট নদীটা, সেটাও যেতে-যেতে কেমন করুণ চোখে তাকায় । আহা, শালগাছটা মরে গেল গো ! কত সাদা-সাদা ছোট ফুল ফুটত । নদীটা যখন আরও ছোট ছিল, জল কম ছিল, পাশের গ্রামের আদিবাসী ছেলেগুলো গোরু চরাতে এসে হেঁটে পেরিয়ে যেত, বোশেখ মাসে জল তোলপাড় করে চান করত, সেই সময় থেকেই তো নদীটা আসতে-যেতে শালগাছটাকে দেখে আসছে । আহা ! গাছ নয় তো, যেন বনের দেবতা । গাছটার খালি জায়গাটা কেমন মরা পাতায় ছেয়ে আছে এখন ।"

দিপু থামল ।

মহাদেব বলল, "ঠিক বলেছিস । গাছ মরে গেলে আমারও খুব দুঃখ হয় । তুই জানিস না, ওই সামনের বাগানে আমি আগেও একটা শিউলিচারা লাগিয়েছিলাম । ক' বছর পরে ফুলও দিচ্ছিল । সকালবেলা গোড়াটা সাদা হয়ে থাকত । তা সে গাছটা একদিন মরে গেল । তখন আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল । গাছ মরে গেলেও বড় দুঃখ হয় রে দিপু । ভাবছিলাম, সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই, যেদিকে দু' চোখ যায় । কিন্তু তোর দাদু সে-কথা শুনে হেসে বাঁচেন

না। তোর ঠাকুমাকে বলেন, 'ওগো, ভ্রমানন্দ বৈরাগীর কথা শুনছ। পাগল! আস্ত পাগল। দুনিয়ায় তোর মতো কত পাগল আছে রে মহাদেব?'"

দিপু শুনতে-শুনতে বলে, "শিউলিগাছটা মরে যেতে এত কাণ্ড? তা, ঠাকুমা কী বললেন?"

"হেসে বললেন, 'আর-একটা চারা লাগাস মহাদেব। আমি পয়সা দেব। রথের মেলায় কিনে আনিস।' যত পাগলের কাণ্ড!"

"তুমি আনলে মহাদেবদা?"

"আরে, ওই তো সেউ শিউলিগাছটা। এখনও ফুল দেয়। কিন্তু কর্তাবাবু আজ নেই। শুধু কথাগুলো মনে পড়ে গেলে দুঃখ হয় রে দিপু!"

"কিন্তু তুমি তো কোনও পাখি মারোনি যে, তার দুঃখে গাছটা মরে যাবে। ওই যে আগের গাছটা..."

"না রে, পাখি মারব কেন? তবে জানিস? একদিন তোদের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজারি এসে বলতে, ডালে ঝাঁকুনি দিয়ে ফুল নিয়েছিলাম। গাছটা তাই ব্যথা পেয়েছিল বোধ হয়। এ যে জোর-জুলুম করে নেওয়া রে! লোভ! বুঝলি, মানুষের লোভ। কেন বাপু, গাছ খুশি হয়ে যা দিচ্ছে, তাই নে না। তাই নিয়ে সংসারে থাক না।"

দিপু বলল, "কেন? সকালবেলা গাছের তলায় ফুল পড়ে থাকেনি?"

"ছিল। ক'টা দুষ্টু ছেলেমেয়ে এসে কুড়িয়ে নিয়েছিল। আমি দেখেও বলিনি কিছু। আহা! আনন্দ করে নিচ্ছে, নিক। সে যাক। তোর কুর্চিফুলের গাছটা কী করল শেষ পর্যন্ত?"

দিপু একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, "কুর্চিগাছটাও মরে যেত হয়তো। কিন্তু একদিন সে দেখল, সেই শালগাছটা যেখানে ছিল, তার পাশেই একটা শালচারা হয়েছে। বেশ তাজা, গাট্টাগোট্টা। দেখলে বোঝা যায়, গায়ে বেশ জোর আছে।"

মহাদেব হেসে বলে, "তোর মতো আর কি! তারপর?"

দিপু সে-কথায় কান দিল না। বলল, "কুর্চি ভাবল, আগের গাছটার ছেলেমেয়ে কেউ হবে। কিন্তু যদি এ-চারাটাকে ছাগল, গোরু খেয়ে নেয়? কী করে বাঁচানো যায় এটাকে? তাই ভেবে-ভেবে একদিন একটা কাণ্ড করল।"

মহাদেব বলল, "কী কাণ্ড রে?"

দিপু বলে, "কুর্চির একটা বড় ডাল, পোকা লেগে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। একদিন, তখন ঝড়ের মতো বাতাস বইছে। গাছটা সেই বাতাসকে বলল, 'ও ভাই, আমার ওই ডালটা ভেঙে এমন করে ফেলে দেবে? যাতে শালচারাটার চারদিকে একটা বেড়ার মতো হয়ে যায়?'

"ঝড় বলল, 'হুঁ, দিতে পারি। আমাকে কী দেবে বলো?'

"'কী দেব? তা আমার তো আর কিছু নেই। ফুল ফুটলে সব গন্ধ তোমাকে দিয়ে দেব? কী, রাজি?'

"'আচ্ছা, রাজি।'"

দিপু বলে, "জানো মহাদেবদা, একদিন ডালটা শালের চারাটার চারদিকে একটা বেড়ার মতো পড়ে গেল। কেউ দেখতেই পেল না চারাটাকে। তারপর কত বছর পরে একদিন সেটা বড় হল। ফুল এল। শুধু সেই পাখিটা আর এল না। কী করে আসবে বলো? সেটা তো কবে মরে গেছে। তাই না মহাদেবদা?"

দিপু চুপ করে যায়।

মহাদেব বলল, "তোর গপ্পো শেষ? তা বড় ভাল লাগল রে।"

দিপু বলে, "বোর্ডিংয়ের সবাই শুনে অবাক। একজন বাংলার সারকে বলে দিল। বাংলার সার বললেন, 'দিপু, লিখে ফ্যালো। লিখে আমাকে দেখাবে। স্কুলের ম্যাগাজিনে ছেপে দেব।'"

মহাদেব বলল, "দেওয়ার আগে আমাকে পড়ে শোনাস কিন্তু।"

"আচ্ছা, তুমিই বলো, গাছ কদ্দিন একা-একা থাকে? কার সঙ্গে কথা বলবে সে? তাই না?"

"ঠিকই। তারও যে একটা বুড়ো মহাদেবদা চাই রে।"

"গাছ আর কার সঙ্গে কথা বলতে পারে মহাদেবদা?"

"বাতাসের সঙ্গে, রোদের সঙ্গে, বৃষ্টির সঙ্গে, মাটির সঙ্গে। গাছগুলোর সবচেয়ে কী সুবিধে জানিস? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেও

দেদার কথা বলে যেতে পারে। তবে জানবি, পাশের গাছের সঙ্গে যেমন সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারে, তেমন অবশ্য আর কারও সঙ্গে নয়।"

রাত আরও বেড়েছে। ছিটেবেড়ার ঘরের চারদিকে অন্ধকার আরও চুপচাপ। খামার থেকে পাকা ধান আর খড়ের গন্ধ এ-পর্যন্ত আসছে না। শিশির পড়ছে নিঃশব্দে।

দিপু বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে। মহাদেবদার কোলে হাত রেখে বলে, "তোমার গ্রামের কাছে নদী ছিল?"

মহাদেব একটা ইস্কুল-পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। বলল, "ছিল, এখন সেটা খাল।"

"তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে?"

"বলতাম, তবে বুঝত না। নদী যেমন কথা বোঝে, কথা শোনে, খাল তেমন নয়। বুদ্ধি একটু মোটা কিনা!"

"তুমি নিজের গ্রাম ছেড়ে কত বছর এলে মহাদেবদা?"

"তা, চল্লিশ বছরের বেশি।"

"আর যাওনি?"

"না।"

মহাদেব কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মনে-মনে সে তার গ্রামের শূন্য ভিটের ছবিটা দেখতে পায়। মাটির দেওয়াল কবে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। গাছপালা কেটে নিয়েছে প্রতিবেশীরা। পান বরোজটাও আর নেই। তবে সামনের ডোবায় হয়তো এখনও কলমি ফুল ফোটে। ধারে-ধারে শুশনি শাক হয়ে থাকে। উঠোনে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় কি এখনও ফুল হয়? না কেটে নিয়ে গিয়েছে কেউ।

হ্যাঁ, চল্লিশ বছর। কোথা দিয়ে কেটে যায় বছরগুলো? যখন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, তখন তার দাড়ি ছিল না। তবে বাবরি চুল ছিল, যাত্রার দলে বিবেক সাজত সে। ঘর ছাড়ার সময় মাথায় একটা গেরুয়া রঙের পাগড়ি জড়িয়েছিল। আসলে ঘরে একটা উড়ুনি ছিল। সেটাই রং করে নেওয়া। হাতে একটা লাঠি, কাঁধে লম্বা ঝোলা। ওই গেরুয়া রঙের জন্য খাওয়া জুটে যেত।

দিপু চোখ বুজে শুয়ে থাকে চুপ করে।

আজও মহাদেবের মনে আছে, সেই শেষ রাতে যখন পুব দিকটা ফাঁকা হয়ে আসছে, শিলাবতীর ছোট্ট শাখা নদীটায় যখন রূপনারায়ণ থেকে জোয়ার এসেছে, গ্রাম যখন নিঝুম, মাঠে-মাঠে পাকা ধান মাটির কোলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তখন মহাদেবের মনটায় কেন যেন কান্না এসেছিল!

আসলে ঘর ছাড়ার ইচ্ছেটা অনেকদিনের। বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই। তার দাদুও নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘর ছাড়ার বেদনাও কম নয়। এক ছোট পাঠশালা থেকে, বড় পাঠশালায় যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? শেকড়ে টান পড়ে। সে টান বড় কঠিন। তার কাছে ভিটের বন্ধন যখন নতুন করে বড় হয়ে উঠছিল, তখনই সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। সোজা ঘাটালের পথ ধরে সে। না, ঘরের কথা সে আর ভাববে না।

কিন্তু দুনিয়াটা বড় আশ্চর্য! 'বল, কারে খুঁজিস খ্যাপা দেশ-বিদেশে, আপন ঘরে খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।' নিজের ঘরই তো সব। কিন্তু কোনটা নিজের ঘর? এই তো সে চল্লিশ বছর মহাপাত্রদের ঘরে রয়েছে। এটাও কি নিজের ঘর? না ঠাকুর, নিজের ঘর নয়। তবে কখন নিজের ঘরে যাবে মহাদেব? ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজবে কখন? এবার নিজের ঘরে একবার গেলে, আর ফিরবে না সে!

কিন্তু ঘর ছাড়ার যে বড় কষ্ট ঠাকুর। চলতে গিয়েও মহাদেব বারবার ফিরে-ফিরে দেখছিল। বাঁশবনের জন্য অবশ্য পুরোটা দেখা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া শেষ রাতের অন্ধকার সবেমাত্র একটু-একটু করে ফরসা হচ্ছে তখন।

কিন্তু একটু পরেই রাস্তার পাশে সেই তাদের পাঠশালাটা পড়েছিল। ওখানে মহাদেব নামতা মুখস্থ করত সুর করে। দ্বিতীয় মান পর্যন্ত পড়েছিল। মাটির দুটো ঘর, বাঁশের জানলা। শিরীষ কাঠের কপাট। তার ওপর আলকাতরা মাখানো। দাওয়ায় বাঁশের যে খুঁটিগুলো, সেগুলোর গোড়া নোনায় ক্ষয়ে গিয়েছে। বাচ্চাগুলোর দুষ্টুমি তো আছেই। এখানে-ওখানে দাওয়ার মাটি উঠে গিয়ে

এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গিয়েছে।

তবু তো তার ইস্কুল এটা। এইখানেই পণ্ডিতের কাছে সে অ-আ-ক-খ শিখেছে। অঙ্ক শিখেছে— যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। এই দাওয়ার মাটিতে তার গলার স্বর এখনও মিশে আছে!

কী ভেবে মহাদেব ইস্কুল ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসেওছিল একটু সময়।

ক্রমশ পুব আকাশ ফরসা হচ্ছে। পাখি ডাকছে বৃদ্ধ বকুল গাছটায়। নয়ানজুলির ওপারে হোগলা বনেও বোধ হয় বক বা অন্য কোনও পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে।

মহাদেবের মনে হয়, সে এখনও যেন সেই সাত-আট বছরের পড়ুয়া বা তারও কম। তালপাতার বাণ্ডিল, আর খুদচোয়ানো কালির দোয়াত নিয়ে পাঠশালায় আসছে। ইস্কুলকে বলত পাঠশালা। খাগের কলম, তালপাতার আঁটির সঙ্গে আছে।

হরি পণ্ডিত সুর করে নামতা মুখস্থ করাতেন। ভুল হলে কী মার কী মার? একটা বিশেষ ছড়ি থাকত তাঁর। দেখতে খুব বড় নয়। ছড়িটা পাকা বাঁশের কঞ্চি থেকে তৈরি। ছেলেরা বলত 'চণ্ডাল হাড়'। তা হরি পণ্ডিত ছড়িটাকে খুব যত্ন করতেন। ছেলেদের পেটানোর মধ্যে আনন্দও পেতেন কিনা কে জানে! নিজেরছেলেমেয়ে কেউ ছিল না।

তা সেই হরি পণ্ডিত শেষ বয়সে পক্ষাঘাতে পড়ে ছিলেন। যে হাত দিয়ে কত ছেলেকে মেরে-মেরে রক্ত বের করে দিয়েছেন, সে হাত তখন আর উঠত না! কী কষ্ট তাঁর।

একটু পরেই গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল সে। আর ফিরে তাকায়নি। সে আজ কত বছর হয়ে গেল! কত বছর! ভাবতে-ভাবতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে তার।

॥ ৩ ॥

মহাদেব বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকায়। কয়েক মুহূর্ত হ্যারিকেনের আলোয় এই ছিটেবেড়ার ঘরটাকেও তার অচেনা লাগে।

দিপু বলে, "হেঁটে-হেঁটে যে আসছিলে তা বৃষ্টি হলে কী করতে?"

"গাছতলায় দাঁড়াতাম। গাছের পাতাগুলো আমার গায়ে বৃষ্টি পড়তে দিত না। ঘরছাড়াদের গাছ বড় ভালবাসে রে?"

"বাঃ, কী মজা মহাদেবদা। আচ্ছা, ঘুম পেলে?"

"গাছতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে দিব্যি টেনে ঘুম। ছায়াগুলো পাহারা দিত আমাকে। গাছ হাওয়া দিত। কী স্নেহ রে দিপু! আসলে পথ-ঘাট, নদী-খাল, গাছপালা সব যে তখন নিজের ঘর হয়ে গিয়েছে।"

দিপু চুপ করে কী যেন ভাবে। একটু পরে বলে, "আচ্ছা, পথেঘাটে লোকের সঙ্গে দেখা হত না?"

এই সময় মহাদেবের একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। পথে চলতে-চলতে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। দুটো রাস্তা দু'দিকে গিয়েছে। একটা তো গোপীবল্লভপুরের দিকে। মহাদেব আগে থেকেই শাল-গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটু আগে পথের ধারের এক দোকানদার মুড়ি-বাতাসা খেতে দিয়েছিল তাকে। গেরুয়া পাগড়ির জন্য খাওয়া বেশ জুটে যাচ্ছিল, যদিও তার কাছে কিছু টাকা আছে পান বিক্রি করার।

সন্ন্যাসী পরে আসেন।

বোধ হয় আর-একজন পথিককে বিশ্রাম করতে দেখে তাঁরও ইচ্ছে হয় বিশ্রাম করতে। এই সন্ন্যাসী খুব বৃদ্ধ। পাকা দাড়িগোঁফ, কাঁধে গেরুয়া রঙের ঝোলা, হাতে বাঁকানো-বাঁকানো কাঠের লাঠি। নাকে তিলক।

সন্ন্যাসী শালগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন।

মহাদেব উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে।

'জয়গুরু' বলে সন্ন্যাসী বসে পড়লেন গাছতলায়।

মহাদেব কী কথা বলবে বুঝতে পারছিল না। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন মহাদেবকে। যেন মুখের রেখার মধ্যে কোনও পুরনো পুঁথির শ্লোক লেখা আছে।

হঠাৎ ওঁর মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়ে এল, "হুঁ, বড় ভাল আধার। তা নাম কী?"

মহাদেব কিছু বুঝতে পারে না। নামটা বলতে, সন্ন্যাসীর মুখে একটা আশ্চর্য হাসি খেলে যায়।

এ-কথা সে-কথার পর সন্ন্যাসী তাকে বলেছিলেন, "মহাদেব, তোমার সময় হয়নি বাছা।"

মহাদেব বিনীতভাবে বলে, "কিসের সময় ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী একটু থেমে হেসে বলেন, "ইস্কুল ছুটির।"

মহাদেবের কাছে এ-কথা রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সে জানায়, "কিন্তু, আমি তো ঘর ছেড়ে দুনিয়া দেখতে বেরিয়েছি মাত্র। আমি সাধু নই, হওয়ার ইচ্ছেও নেই।"

সেই নীরব হাসি আবার সন্ন্যাসীর মুখে। কী যেন ভাবেন তিনি। একটু পরে হঠাৎ বলেন, "ঘরছাড়া করল কে?"

"কেন? আমি নিজেই বেরিয়ে এসেছি। কেউ বলেনি আমাকে।"

"সে বলা যে কান শুনতে পায় না মহাদেব। শুধু তোমার মধ্যে যিনি আছেন, তিনি শুনতে পান। বুঝলে, সবই তাঁর ইচ্ছে।"

বলেই সন্ন্যাসী চোখ বুজে দু' হাত জোড় করে বলেন, "জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ/ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।" তারপর একটু থেমে আবার বলেন, "বুঝবে, বাবা, বুঝবে। সময় হোক, পাতা ঝরুক, তবেই তো নতুন পাতা গজাবে।"

মহাদেব বুঝতে পারল, এ হলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। কথায়-কথায় জানতে পারল, আসছেন আরামবাগ থেকে।

ওঠার আগে সন্ন্যাসী বললেন, "যে পথ দিয়ে তুমি যাচ্ছ মহাদেব, কতকাল আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিনাম করতে-করতে ঝাড়গ্রামের এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন। তা জানো ?"

কথাটা শুনে মহাদেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সন্ন্যাসী দু' হাত জোড় করে নিজের মনে বলে যান, "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে হে, মিথ্যে নয়—'বলভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে/ ঝাড়ি খণ্ড পথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে' —সেটা এই পথ। ঠিক পথেই হাঁটছ মহাদেব। হাঁটতে-হাঁটতে তাঁকে মনে-মনে ডাকো, তাঁর গান গাও, হরিনাম করো।"

উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। বললেন, "পুরীতে আমার আশ্রম আছে—'নিত্যানন্দ আশ্রম'। কখনও ইচ্ছে হলে এসো।"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে চলে যান। একটু পরে আর দেখা যায় না। গাছপালা আড়াল হয়ে ওঠে। শুধু পথটা চোখে পড়ে, যা ওই দূর আদিবাসীদের গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে।

বেলা আরও পড়ে আসে। শালগাছের ছায়া দীর্ঘ হয়। যেন কেউ বাঁশির সুরে ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ছায়াগুলোকে। কিন্তু কোথায় ? মাঠের পশ্চিমের আকাশে কোনও সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে নাকি ?

এই তার প্রথম ঘরছাড়া জীবনের একতারায় কে যেন অন্য একটি গান গেয়ে গেল।

মহাদেব দিপুকে ডাকে। কোনও সাড়া নেই। ইস, ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

॥ ৪ ॥

দিপুকে কোলে করে নিয়েই মহাদেব গিন্নিমার ঘরে ঢুকল। আজকাল উনি কিছু খেতে চান না, কারও কথা শোনেন না। শুধু মহাদেব বললে, কাছে এসে দাঁড়ালে, একটু কিছু মুখে দেন। আজও তাই হল।

মহাদেব বুঝতে পারে, গিন্নিমার জীবনে বড় দুঃখ। খোকাবাবু কলেজে পড়ার সময় বিয়ে করে বসে বাড়ির অমতে। সেটা তবু গিন্নিমা মেনে নেন। কিন্তু বউমার মন বড় ছোট। তা মহাপাত্রবাড়িতে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' লেগেই থাকত। বউমা আসতে সব একে-একে বন্ধ। জমিদারি উঠে গিয়েছে। অপব্যয় চলবে না। কড়া হুকুম বউমার। চলে গেল কয়েকজন পুরনো দিনের কাজের লোকের চাকরি। মহাদেবের ওপরেও খাঁড়াটা পড়তে যাচ্ছিল। বউমার রাগও তার ওপর বেশি। কারণ, লোকটা সকলের ওপর ছড়ি ঘোরায়। গিন্নিমা আর রাগ সামলাতে পারেন না। বলেই ফেলেন, "ও কে তোমরা জানো বউমা ? চেনো ওকে ? ও মহাপাত্র পরিবারে দয়া করে আছে, জানবে, দয়া করে।"

গিন্নিমা বড় তেজী মেয়ে।

কিন্তু সেই থেকে মহাদেব নিজের খাওয়া-পরা নিজেই চালায়। শুধু চাল, আলু, তরকারি আসে এস্টেট থেকে। কর্তাবাবু যে মাইনে দিতেন, সেটা পোস্ট অফিসে জমা থাকত। তা থেকে কিছু-কিছু ওঠায়। আগে যে কাজ দেখাশোনা করত, এখনও তাই করে। কিন্তু মাইনে আর নেয় না।

মহাদেব বুঝতে পারে গিন্নিমার দিন শেষ হয়ে আসছে। আহা ঠাকুর, গিন্নিমা মৃত্যুর সময় যেন কষ্ট না পান।

মহাদেব একটু পরেই চলে এসেছিল গিন্নিমার ঘর থেকে। এসে চুপ করে বসে ছিল বারান্দায়, সেই বেঞ্চটায়। শীত করছিল খুব। তবু কেন যেন ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। এই শীতলাগা অন্ধকারে যেন একটা মৃত্যুর ছোঁয়া লেগে আছে বলে তার মনে হয়।

রাত বাড়ছে। কোথাও লোকজন নেই। ঝাড়গ্রাম যাওয়ার রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। শাল-জঙ্গল নির্জন। সে নির্জনতা ক্রমে-ক্রমে ঘন হয়ে থিতিয়ে বসে।

পরদিন একটু সন্ধের দিকে দিপু চটির শব্দ করতে-করতে হাজির। নিজেই কাঁটা মেরে সারিয়েছে কখন বা রান্নার ঠাকুর সারিয়ে দিয়েছে। লোকটা টুকিটাকি কাজ জানে।

মহাদেব একটা ইস্কুল-পত্রিকার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, "কী রে, পড়তে-পড়তে পালিয়ে এলি ? মা মারবে না ?"

বউমার আর-এক দোষ, ছেলেটাকে বড্ড মারে, বিশেষ করে বাবু বাড়ি না থাকলে। উনি তো এখন মেদিনীপুরে। বর্গা নিয়ে, দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে।

দিপু ধপ করে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ে বলে, "ও মহাদেবদা, কাল তোমার গল্পটার শেষটা বলোনি। এখন বলো দেখি। কেবল ফাঁকি মারার তালে আছ।"

"ফাঁকি ! সে কী রে ! কর্তাবাবু পর্যন্ত বলার সাহস করতেন না। আর তুই ?"

"থাক। রাখো ও সব।"

বলেই দিপু পত্রিকাটা কেড়ে নেয়। নিয়ে ছবি দেখতে থাকে। হঠাৎ নজরে পড়ে যায়, এক জায়গায় মহাদেব বৈরাগীর নাম, একটা কবিতার নাম, একটা কবিতার নীচে। অবাক ! এ কী ! সে ঠিক দেখছে তো ?"

মহাদেব বলে, "দে না, তুই কী দেখছিস ?"

দিপু বলে, "আঃ, দাঁড়াও না বাবা।"

মহাদেব বলে, "এই দিপু, কী হচ্ছে ওটা। দে বলছি।"

দিপু বলে, "কবিতার নাম 'সুবর্ণরেখা'।"

মহাদেব আবার ধমক দেয়, "দিপু, কী হচ্ছে ? বারণ করছি না ?"

দিপু বলে, "ধ্যেত, দাঁড়াও না, কী যে করো ! কবিতা পড়ছি। চ্যাঁচাও কেন ?"

কী যে মনে হয় দিপুর, সে একটু চুপ করে থাকে। সুবর্ণরেখা! হুঁ, সে তো এ নামটা জানে। খুব বড় নদী। তাদের ভূগোলে আছে। সে ছবি দেখেছে শুধু। মহাদেবদা সেই নদীটাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। কী মজা! কী মজা!

দিপু মহাদেবদাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "সুবর্ণরেখা কোত্থেকে এল, মহাদেবদা?"

কী ভাবতে-ভাবতে মহাদেব বলে, "বিহার থেকে। সুবর্ণরেখা খুব সুন্দর নদী। বড় হলে দেখে আসবি।"

"বিহার। সেটা কোথায়?"

"তুই একটা বোকা। বিহার কোথায় জানিস না?"

"না। কী করে জানব?"

"এটা তো ঝাড়গ্রাম। বরাবর উত্তর-পশ্চিমে চলে গেলে বিহার পড়বে। তার আগে পাবি ঢেউখেলানো মাঠ, দেখবি মাঠের শেষ আর আকাশ কেমন চুপচাপ মিশে গেছে।"

দিপু চোখ বড়-বড় করে শোনে, যেন সে মনে-মনে ওই ঢেউখেলানো মাঠের দেশে চলে গেছে, যেখানে আকাশটা নিচু হয়ে মাঠের শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এ মা! মাঠের ভয় করে না?

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, ঢেউ-খেলানো মাঠগুলোর সঙ্গে পাহাড়ের কোথায় একটা মিল আছে। ওইরকম উঁচু হতে-হতে, কখন দূরে গিয়ে হঠাৎ পাহাড় হয়ে উঠেছে। তার বোর্ডিংয়ের ছাদে উঠলে, ঠিক সন্ধের আগেটা, উত্তরদিকে—না, না, উত্তর-পশ্চিমদিকে, কে যেন বলেছিল ওইদিকে গিধনি বলে একটা রেল ইস্টিশন আছে। তা ওইদিকে তাকালে আকাশে কালো ধোঁয়ার মতো কী সব দেখা যায়। বোর্ডিংয়ের তরুণদা বলেছিল, ওটা নাকি ছোটনাগপুরের পাহাড়। তরুণদার কথা মিথ্যে হতেই পারে না। ক্লাস টেনের ফার্স্ট হওয়া ছেলে। আর কী ভাল ফুটবল খেলে। সেন্টার ফরওয়ার্ড খেললে তরুণদা গোল দেবেই। তরুণদা বলেছিল, ওটা নাকি মালভূমি অঞ্চল। মালভূমি? সেটা আবার কী বাবা?

দিপু বলে, "ও মহাদেবদা, সুবর্ণরেখা এল না হয় বিহার থেকে। কিন্তু গেল কোথায়? নদী তো এক জায়গায় গোঁ হয়ে বসে থাকার পাত্র নয়।" মহাদেব পত্রিকাটা নিতে চেষ্টা করেও পারল না। দিপুটা ভীষণ জেদী। কর্তাবাবুর মতো। জেদ চাপল তো, ব্যস। কত মামলা, কত দাঙ্গা!

মহাদেব বলল, "হয়েছে, পত্রিকাটা দে।"

দিপু হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, "দাঁড়াও না। সুবর্ণরেখা কোথায় গেল বলবে তো?"

"অনেক, অনেক দূর। সেই যে, আঃ কী নামটা যেন। সেই যে···"

"দুর বাবা। সেইটা কোথায়?"

"দাঁতন জানিস?"

"না। দাঁতন, পেস্ট, ওসব বলে কিচ্ছু হবে না। আমি জানতে চাই সুবর্ণরেখা কোথায় গেল। ব্যস।" মহাদেব বুঝতে পারে, ওকে ভুলভাল বলে ঠাণ্ডা করা যাবে না।

বলল, "স্থির হয়ে শোন। লোকে বলে মহাপ্রভু নাকি ঝাড়গ্রাম হয়ে ওই দাঁতনের পাশ দিয়ে ওড়িশায় গিয়েছিলেন। তখন বলত ঝাড়গ্রাম নয়, ঝাড়খণ্ড।"

দিপু রেগে যায়। বলে, "দুর ছাই, কী জিজ্ঞেস করছি, আর কী উত্তর দিচ্ছ। আমাদের বাংলার সার হলে, তোমাকে কী দিত জানো? এই, এতবড় একটা রসগোল্লা।"

মহাদেব তক্তপোশে বসে পড়ে বলে, "আচ্ছা বল, কী বলছিস।"

"এতক্ষণ ধরে তো বলছি বাবা। তোমার সুবর্ণরেখা নদীটা কোথায় গেল?"

"নদী যেখানে যায়।"

"ওই তো আবার এক ফ্যাকড়া তুলে বসলে। নদী কোথায় যায়?"

"সমুদ্রে যায়। সে যাবেই। জানিস রে দিপু, সমুদ্র দেখতে না পেলে নদীর মন ভরে না। আমারই সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে হয়।"

দিপু স্থির হয়ে বসে। বসে-বসে ভাবে, হুঁ, নদী সমুদ্রে যায়। যাক, যেতে দাও। মহাদেবদাও যদি যেতে চায়, যাক না। সমুদ্র জায়গাটা নিশ্চয়ই ভাল। সে ভূগোল-বইতে দেখেছে সমুদ্রের ছবি, নারকেল গাছের সার দেওয়া সমুদ্রতীর। লোকজন নেই। শুধু বালি, বালি, বালি। আর যদ্দূর চোখ যায় শুধু জল, জল আর জল। এক সময় আকাশের সঙ্গে মিশে যায়। ও, সুবর্ণরেখা তা হলে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তা বেশ!

কী ভেবে-ভেবে দিপু আবার একটা পত্রিকা টেনে নেয় জানলার নীচ থেকে। এমনভাবে পাতা ওলটায় যেন ছিঁড়ে ফেলবে।

মহাদেব ধমক লাগায়, "আবার কী হচ্ছে? রাখ বলছি।"

দিপু ধমক শোনার পাত্র নয়। কে শোনে মহাদেবদার ধমক। তার পুসি বেড়ালটাও ও ধমকে কান দেবে না। মহাদেবদা তো পাগল। ঠাকুমাও বাবাকে বলেন, "মহাদেবটার পদবি বৈরাগী, কাজেও বৈরাগী, স্বভাবেও বৈরাগী। কোথাও কোনও টান নেই, লোভ নেই। ওকে ছাড়াস না খোকা। ওর মতো মানুষ লাখে একজনও হয় কিনা সন্দেহ। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি···"

মহাদেব বলে, "দিপু, পত্রিকাটা ছিঁড়ে ফেলবি। যা, বাড়ি যা এখন।"

দিপু কিন্তু আবার পাতা উলটে খুঁজতে থাকে। মহাদেব বৈরাগী নামটা আর কোথাও আছে কিনা।

মহাদেব পত্রিকাটা নিয়ে নেয়। তারপর জানলার তাকে খুব যত্ন

করে একসঙ্গে গুছিয়ে রাখে। এগুলো তার বড় আদরের জিনিস।

দিপু ওপরের ছবিটা দেখতে পায়। একটা বড় পাকা বাড়ি, সামনের উঠোনে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

আরে তাই তো, নীচে লেখা আছে : আনন্দনগর বিদ্যামন্দির। বার্ষিক সঙ্কলন। পোঃ আনন্দনগর, মেদিনীপুর।

দিপুর মনে পড়ে, কিছুদিন আগে তাদের স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তীতে এমনই একটা পত্রিকা বেরিয়েছিল। রৌপ্য জয়ন্তী ? সেটা কী জিনিস বাবা ? তাতে তরুণদার লেখা ছিল। ফুটবল ম্যাচ নিয়ে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না, তরুণদা ওই স্কুলের ভাল ছাত্র। তাই সে লিখেছে। কিন্তু মহাদেবদা তো ছাত্র নয়। সে বুড়ো। চুলদাড়ি পেকে ধবধবে সাদা। তবে কী মহাদেবদা কখনও ওই স্কুলে পড়ত ?

দিপু বলে, "আচ্ছা। তুমি কি এই স্কুলে পড়েছিলে মহাদেবদা ?"

মহাদেব হেসে বলে, "দুর বোকা। আমি কি ইস্কুলে পড়েছি ?"

"তবে ?"

"আমি সেই চৈতন্যপুর পাঠশালায় পড়তাম। আজকাল আর

পাঠশালা নেই রে। দেখবি কোত্থেকে ?"

দিপু ভেবে-ভেবে বেশ গম্ভীরভাবে বলে, "কোন ক্লাস ?"

"ক্লাস ? আরে না না, দ্বিতীয় মান।"

"সেখানে ক্লাস টেন ছিল না ?"

মহাদেব হেসে বাঁচে না। "দুর বোকা, পাঠশালায় ক্লাস টেন থাকবে কী করে ?"

দিপুর অবিশ্বাস কিছুতেই যায় না। না থাকলে মহাদেবদা কবিতা লিখল কী করে। ছাপা হল কেন ? বাবা বাড়ি না থাকলে, মা বেড়াতে গেলে, মহাদেবদা ইংরেজি চিঠিও টেনেটুনে পড়ে ঠাকুমাকে শোনায়। সব জমিজমার ব্যাপার। কী করে পড়ে ? দুর ! মহাদেবদা বড্ড বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলে।

খামারে কারা গোরুর গাড়িতে করে ধানের বিড়া এনে ফেলছে। এর পর গাদি দেবে। তাদের টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসে অন্ধকারে।

গম্ভীর হয়ে দিপু বলল, "তুমি ওই ইস্কুলে না পড়লে তোমার কবিতা বেরোল কেন ?"

মহাদেব কী বলবে বুঝতে পারে না। তবে কথাটা ঠিক। দিপুটার মাথায় বুদ্ধি আছে।

"তুমি এই ইস্কুলে গেছ মহাদেবদা ?"

"না।"

"ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে জানো ?"

"না। তবে উনি প্রতি বছর বই বেরনোর সময় চিঠি লেখেন। এবারও লিখেছেন। কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি কবে। বইটা দু-চার দিনের মধ্যে এসে যাবে হয়তো।"

"চেনা না হলে কবিতা চেয়ে পাঠাবেন কেন ?"

মহাদেব ভাবে, আর পারা যায় না দিপুটাকে নিয়ে। উঃ, এত কথা বলতে পারে ! আর এত কিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন। ব্যাপারটা খুলে বলাই ভাল।

মহাদেব বলল, "শোন। এই বিছানায় চুপটি করে বোস। একটা গল্প বলি তোকে।"

দিপু খুশি হয়ে বলে, "বা রে, এতক্ষণ সেই গল্পের কথাই তো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।"

মহাদেব বলে, "তখন আমি আনন্দনগর বিদ্যামন্দিরের নামই শুনিনি। আমি কি এই অঞ্চলের লোক রে ?"

দিপু বলে, "তবে তুমি কোন অঞ্চলের ?"

"আমি ঘরছাড়া লোক ভাই। সেই যে বলেছি তোকে, বউ মরে গেল। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। মনে-মনে ভাবলাম, এবার সারা দুনিয়া আমার ঘর।"

দিপু বলল, "কতবার জিজ্ঞেস করছি, বউ কেন মরে গেল ?"

"আয়ু শেষ হলে সবাই মরে যায়।"

"আয়ু কেন শেষ হয় ?"

মহাদেব দেখল, এ তো মুশকিল। বলল, "গল্প শুনবি, না ফ্যাচর-ফ্যাচর করবি ?"

দিপু হাসতে-হাসতে বলে, "গল্পও শুনব, আবার ফ্যাচর-ফ্যাচরও করব।"

"তা হলে গল্প আর বলা হবে না।"

দিপু জোর করে মহাদেবের গলা দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। "হবে না মানে ? হতেই হবে। ইয়ার্কি ?"

মহাদেব হাসতে-হাসতে বলে, "আরে, গলা ছাড় বলছি।"

"এখন ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কাল তোমার গল্পটা শেষ করতেই হবে।"

"কোন গল্প আবার ?"

"কেন ? ওই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝাড়গ্রামের রাস্তা ধরে পুরী যাচ্ছিলে হাঁটতে-হাঁটতে। বৃষ্টি হলে গাছতলায় দাঁড়াতে, ওই যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

মহাদেবের মনে পড়ল। বলল, "ঠিক আছে। কাল বলব।"

॥ ৫ ॥

পরদিন সন্ধেবেলা খামারে কারা ধান তুলছিল। গাদি দেওয়ার কাজ শেষ করে এখন তামাক খেতে-খেতে কথা বলছে। সেইসব কথার টুকরো ভেসে আসছিল মহাদেবের ঘরে।

তার কেমন অদ্ভুত লাগে। পাকা ধান আর খড়ের সঙ্গে চাষিদের ঘর-সংসারের ছোট-ছোট কথা মিশে গিয়ে, কেমন একটা অস্পষ্ট গল্প

হয়ে যায়। যেন কীর্তন গানের আখর ফিরে-ফিরে, ফিরে-ফিরে সুর হয়ে ওঠে!

বিশ্রী শব্দ করতে-করতে রাস্তা দিয়ে একটা বাস চলে গেল।

মহাদেবের মনে পড়ল, পড়া শেষ হলে দিপু এসে হাজির হবে। উঃ কী বকাতে পারে ছেলেটা! কিন্তু সেও বড় মিষ্টি। দিপুর মধ্যে কর্তাবাবুর আদল আছে। মেজাজও তেমনই।

চাষিরা ধান গাদি দিয়ে চলে গেল।

মহাদেব এবেলা রান্না করে না। ওবেলার তরকারি আছে। অন্য সময় হলে জল-ঢালা ভাত আর ওই তরকারি দিয়ে চালিয়ে নিত। কিন্তু এটা পৌষ মাস। সে মুড়ি আর তরকারি খাবে। দুধ তো আছে, মা-ঠাকরুন পাঠিয়েছেন।

কাজের লোক দিপুকে দিয়ে গেল। কেমন মুখটুখ শুকনো লাগছে। কী জানি, পড়ানোর সময় বউমা মেরেছে হয়তো।

দিপুও মহাদেবের বিছানায় শুয়ে পড়ে কাঁথাটা বুক পর্যন্ত টেনে নেয়। তারপর ওই পত্রিকাগুলো খোঁজে। কিন্তু আজ যেন তেজ একটু কম।

মহাদেব ঘরের টুকটাক কাজ সেরে বলল, "ঠাকুমা, কী করছেন রে?"

দিপু বলল, "ঠাকুমা বিছানায় আহ্নিক করছেন।"

"সন্ধেবেলা খেয়েছেন কিছু?"

মহাদেব জানে, ঠাকুমার যত্ন ঠিকমতো হচ্ছে না। আসলে খোকাবাবুর বিয়েটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তার কিছু করার নেই। অথচ কী স্নেহ পেয়েছে সে মা-ঠাকরুনের কাছ থেকে। ঘরছাড়াটাকে এই মহাপাত্রদের জমিদারিতে আটকে রাখল কে? কেবল কর্তাবাবু নন, মা-ঠাকরুনও।

"শেকড় গো, জীবনগাছের শেকড়। সে কী একটা? সে যে অনেক, চারদিকে ছড়ানো। অনেক গভীরে যায়, আবার মাটির একটু নীচেও থাকে।"

মহাদেব ভাবে, তার জীবনের যে ক'টা শেকড় আর আছে, সেগুলো কবে কী করে ছিঁড়বে ঠাকুর!

দিপু একটু চুপচাপ।

মহাদেব বলল, "মা বকেছে না কি রে?"

দিপু এপাশ-ওপাশ করে একটু। যেন কষ্ট হচ্ছে কিছু। বলল, "না, মহাদেবদা।"

"মন দিয়ে পড়েছিস আজ? ইংরেজি পড়েছিস?"

মহাদেবের খুব ভাল লাগে ইংরেজি পড়া শুনতে। কেমন মিষ্টি-মিষ্টি, সংস্কৃতের মতো, ওই পণ্ডিত পীতাম্বর সনবিগ্রাহী যখন গীতা পড়েন, মন্ত্র পড়েন, কিছুটা তেমনই সুরেলা।

দিপু কাঁথাটা টেনে নিয়ে মুখে ঢাকা দেয়।

একটু অবাক হয়ে মহাদেব বলে, "এই অবেলায় শুয়ে পড়লি কেন রে?"

"এমনই। কিন্তু মহাদেবদা, তুমি এ-পত্রিকা পেলে কোথায়? চেনা হল কী করে? সে বলোনি কিন্তু।"

মহাদেব বলে, "তা হলে গোড়া থেকে শোন। অনেক বছর আগে, কর্তাবাবুর নামে দুটো চিঠি আর একটা পত্রিকা পিয়ন দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। পত্রিকাটা অন্যের। নামটা কার জানিস? এখানকার প্রাইমারি স্কুলে যে নতুন ছোকরা মাস্টার এসেছিলেন, তাঁর। তিনিও থাকতেন এই বাড়িতে। কী একটা অন্য চাকরি পেতে মাস্টারি ছেড়ে দেন। তাঁর ঠিকানাও জানি না। পত্রিকাটা থাকে আমার কাছে। একদিন পড়ছিলাম।"

দিপু বলে, "কী নাম পত্রিকার?"

"আরে, ওই তো আনন্দনগর বিদ্যামন্দির। ওই মাস্টার স্কুলে পড়তেন। ভাল ছাত্র বলে নামও ছাপা হয়েছিল তাঁর। তা তোর কী হয়েছে রে? মাথা টিপে ধরে আছিস?"

"কোথায় কী হবে? তা কী ছিল পত্রিকায়? গল্প?"

"তা ছিল। আর ছিল, চারদিকে বর্ডার দেওয়া একটা আবেদন, 'দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য ভাণ্ডারে সাহায্য পাঠান। একটি ছেলের কিছু ভার নিন'।"

দিপু মাথাটা টিপে ধরে রেখে শুনছিল। এখন খুব শীত করছে তার। মাথাটা ধরেছে, তবে মহাদেবদাকে তা বলবে না। কাউকে না। মা মারবেন। সে বলল, "তুমি বুঝি টাকা পাঠালে?"

"তা পাঠিয়েছিলাম। কেন রে?"

"জানো মহাদেবদা, আমাদের সঙ্গে পড়ে নীলমণি জানা। খুব গরিব। অনেক বই নেই। ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে স্কুলে আসে।

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিলিয়ে নিও

এবারের ছবিতে দ্যাখো একটা ত্রিভুজ এবং একটা বৃত্ত। এর মধ্য দিয়েই আমি কোন ছবির কল্পনা করেছি, তার আভাস পাবে আগামী সংখ্যায়। তোমরাও কল্পনায় ধরতে চেষ্টা করো কোনও ছবি, পরে আমার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

হাসিখুশি — শতদল

ছাত্র : আপনার দেওয়া যোগ অঙ্কটা আমি দশবার করেছি।
শিক্ষক : তুমি তো খুবই ভাল ছেলে দেখছি।
ছাত্র : আর দেখুন সার। দশরকম উত্তর পাওয়া গেছে।

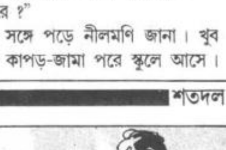

★

বুবলি বলল, "সকালের খাবার খাওয়ার আগে আমি প্রতিদিন সাঙ্ঘাতিক কঠিন একটা কাজ করি।"
ঝুমকি জিজ্ঞেস করল, "কী সেটা?"
বুবলি বলল, "বিছানা ছেড়ে উঠি।"

দিদিমণি : যদি তোমাকে আট টাকা দিয়ে বাজারে পাঠানো হয়, আর পথে তিন টাকা হারিয়ে যায় তা হলে তোমার কাছে কত টাকা থাকবে?
ছাত্র : আমার কাছে আট টাকাই থাকবে, আমি টাকাগুলি খুব সাবধানে নিয়ে যাব।

ছবি : দেবাশিস দেব

অন্যসব বিষয় পারে। কিন্তু ইংরেজি আদৌ পারে না। সেকেন্ড সার যা মারেন না তাকে। বই না থাকলে কী ইংরেজি পড়া যায়? তুমিই বলো?"

মহাদেব চুপ করে শুনে যায়।

দিপু বলে, "আমার বোর্ডিংয়ে ডেকে এনে আমার থেকে তাকে খেতে দিই। জানো, নীলমণি অঙ্কে খুব ভাল।"মহাদেবের মনে হল, পুরো কর্তাবাবুর চরিত্র। বলল, "শোন, ইস্কুল খুললে যখন যাবি, তখন তোর হাতে দশটা টাকা দেব। নীলমণিকে দিবি, সে যেন ইংরেজি আর তার মানে বই কেনে। না, না তুই নিজে কিনে দিস। কেমন?"

দিপু খুশি হয়। নীলমণি ওর বন্ধু, ওকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। বলল, "খুব ভাল হবে মহাদেবদা। আমি কিনে দেব। কিন্তু শোনো—"

"কী হল আবার?"

"ওই স্কুল পত্রিকা তোমার পদ্য ছাপল কেন? ওরা কী করে জানল, তুমি পদ্য লেখো?"

মহাদেবের সব মনে পড়ছিল। ওই দরিদ্র ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারে পর পর কয়েকবার টাকা পাঠিয়েছিল সে। ক'বছর পরে হেডমাস্টারমশাই পরিচয় জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। নেমন্তন্নের ছাপা কার্ড সঙ্গে পাঠান। কী খেয়ালে মহাদেব একটা পদ্য লিখে তার পরিচয় জানায়। সেটাই প্রথম ছাপা হয়। বলেছিল, পরিচয় কিছু নেই। সে এক ভবঘুরে মাত্র।

দিপু বলে, "সেই কবিতাটা কোথায়?"

মহাদেব খুঁজে-খুঁজে বের করে।

দিপু শুকনো মুখে বলে, "তুমি পড়ো মহাদেবদা। আমার একটু মাথা ধরেছে।"

"সে কী! জ্বরটর বাধাবি নাকি?"

"না, না। তুমি পড়ো, আমি শুনছি। বেশ ভাল করে পড়বে কিন্তু।"

"মহাদেব বৈরাগী এই মোর নাম
পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।
পৃথিবীতে কেউ নেই, তবু আমি জানি
আমার অন্তরে আছে অচেনার বাণী।"

দিপু বলে, "বেশ ভাল হয়েছিল পদ্যটা। মহাদেবদা, তুমি তো পথে-পথে ঘুরতে। কিন্তু এখানে এলে কী করে?"

মহাদেব বলল, "সেটাই তো গল্প রে। কাকে যে কে কোথায় নিয়ে যায়, সে খবর সোজা নয় রে দিপু। সব ঠাকুরের ইচ্ছে।"

দিপু বলল, "সেই ছোট্ট শহরের বাইরে মন্দিরের সামনে, নাটমন্দিরে শুয়ে ছিলে। তারপর?"

"তারপর শেষ রাতে বাসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তখন শহরে কেউ বিশেষ ওঠেনি। শেষ রাতে আর ভোরে পথ চলতে ভাল লাগে। তাই উঠে হাঁটা লাগালাম। কিন্তু বাস গুমটির কাছে, হঠাৎ নজরে এল, একটা সুটকেসের মতো কিছু পড়ে আছে। কাছে গিয়ে তুললাম। ঠিক, একটা চামড়ার সুটকেস। কী করি এটা নিয়ে। কাকে দিই এটা? কোথাও কেউ নেই। বোধ হয় ওটাই ছিল প্রথম বাস। চ'লে যেতে আবার ফাঁকা। কী মুশকিল। ওটা নিয়ে এখন কী করি। হাতে নিয়ে তো বসে রইলাম কিছুক্ষণ। লোকজন এলে, যার জিনিস তাকে দিয়ে চলে যাব।

"কিন্তু কেউ খুঁজে-খুঁজে এল না। মহা ফ্যাসাদ। কার জিনিস। কাউকে জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছি। কিন্তু সে যদি মিথ্যে কথা বলে? জানিস, দিপু, শেষকালে তালাটা ভেঙে ফেললাম ইট মেরে। ভেতরে কী পেয়ে গেলাম জানিস?"

দিপু বলল, "কী পেলে মহাদেবদা?"

"তোর দাদুর নাম, দলিলে লেখা আছে। জমিদার নরহরি মহাপাত্র, লালগড়। আর একটা সোনার হার, প্রায় চার ভরি। তোর ঠাকুমার গলায় এখনও আছে রে। দুটো সোনার বালা। বুঝলি, আমি বড়লোক হয়ে যাচ্ছিলাম প্রায়। কিন্তু কপাল ফাটা রে দিপু। কপাল ফাটা!"

দিপু বিরক্ত হয়ে বলল, "গল্প বলতে-বলতে এত বাজে বকো কেন মহাদেবদা? বাংলার সার আদৌ নম্বর দেবেনই না। বলো, তারপর কী করলে? পদ্যটা পড়ে যাও না তুমি?"

মহাদেব শেষের কয়েকটা লাইন পড়ল:

"কোথা দিয়ে কী যে হল বাবু ভালবেসে
জোর করে রেখে দিল নিজের আবাসে।
এইভাবে কেটে গেল কত যে বছর,
এখন মৃত্যুর দিন এই তো খবর।
মহাদেব বৈরাগী যে ছিল পথিক
আজ তাকে সর্বজন আশীর্বাদ দিক।"

মহাদেব পড়া শেষ করে বলে, "এবার শুনলি তো, কী করে তোদের বাড়িতে এসে জুটলাম। সবটা অবশ্য নয়। হাইকোর্টে মামলায় জিতে, তোর দাদু ঠাকুমার জন্য হার, সোনার বালা, দামি শাড়ি কিনেছিলেন। রেখেছিলেন চামড়ার সুটকেসে। সঙ্গে দশ বিঘে জমির দলিল, কাগজপত্র। আরও কী সব হাবিজাবি জিনিসও সঙ্গে। পোঁটলাপুঁটলিও কম নয়। বাসে ওঠার সময় খেয়াল নেই, সুটকেসটা ভুলে কখন ফেলে এসেছেন বা পড়ে গেছে। মনে পড়ল নামার সময়। তখন মাথায় হাত! তা সেই শহর তখন পনেরো ক্রোশ। যাঃ, সব গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল। যে পাবে সে কি আর দেবে? না এ যুগে কেউ দেয়? সন্ধে হয় হয়। আমি তো সুটকেসটা নিয়ে খুঁজে-খুঁজে লালগড় এসেছি। সব ফিরে পেয়ে তোর দাদু কী খুশি! তক্ষুনি পুকুরে বড় জাল পড়ল। যত বলি, বাবু, আমি মাছ-মাংস খাইনে। কে শোনে কার কথা! আমাকে বলেন, দশ বিঘে জমি দিচ্ছি, ঘর তুলে দিচ্ছি, ভাল মেয়ে খুঁজে দিচ্ছি। বিয়ে করে এখানে থাকো। কোথাও যাওয়া চলবে না। আর তোমার ঠাকুমা তখন তো বাইরে বেরোতেন না। আমার ডাক পড়ল অন্দরমহলে। নিজের

শব্দসন্ধান — রঞ্জন

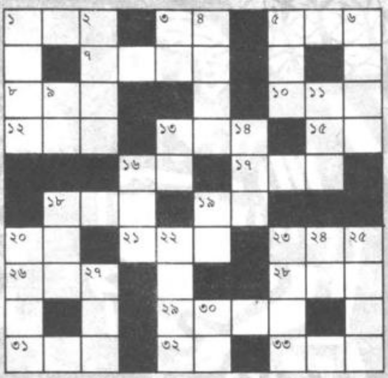

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) সাপ। (৩) শতকরা পেলেই সেই বিষয়ে 'লেটার'। (৫) 'বৃথা গঞ্জ তুমি দশাননে'—এখানে কোন্ শব্দের নামধাতু প্রয়োগ করেছেন মাইকেল ? (৭) আবির্ভাবের বিপরীত। (৮) এক ধরনের ফুটবল-খেলা। (১০) পঞ্চনদীর একটি। (১২) সমুদ্র। (১৩) ভাই-বোন এমনও হয়। (১৫) ভোজনপাত্র। (১৬) কামরা। (১৭) দৃষ্টান্ত। (১৮) চৌকি, নজরদারি। (১৯) গায়ক। (২০) কপট, ক্রূর। (২১) হাজির হওয়ার হুকুম। (২৩) মস্তিষ্ক। (২৬) প্রকার। (২৮) বৃক্ষবিশেষ। (২৯) কোন্ কল ঘণ্টা বাজায় ? (৩১) আঞ্চলিক বাতাবিলেবু। (৩২) এক কুঁচের সমান ওজন। (৩৩) রুশ সভ্যতায় এই জাতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

উপর-নীচ : (১) রূপকথার ঘোড়া। (২) চালচলন, কার্যকলাপ। (৩) প্রভা, দীপ্তি। (৪) বিখ্যাত রসরচনাকার। (৫) দেশ থেকে যা হটানোর কথা অনেক নেতাই বলেন। (৬) প্রেক্ষাগৃহ। (৯) নিরাকার গলা। (১১) বিস্তীর্ণ জলরাশি। (১৩) কুবের যাদের অধিদেবতা। (১৪) একসঙ্গে অনেক মানুষ। (১৬) কাঠ কাটে দাঁতে। (১৮) পাখির ডানার শোভা। (১৯) ফলবিশেষ। (২০) আর-এক ফল। (২২) গণেশ। (২৩) কেঁচো। (২৪) হাতি। (২৫) মেঘ। (২৭) রামায়ণের এক খল চরিত্র। (৩০) বুদ্ধি, অনুরক্তি।

গত সংখ্যার সমাধান

ম	ঞ্জী	র			ট	হ	ল	দা	র
স		হি	ম	শি	ম			ত্যু	
ন		ম	ন		কা		বা	হ	ন
দ	হ		মা	স	কা	বা	রি		শ্ব
	রি	ম	ঝি	ম			ধা	মা	র
বি	ষ	ম			গ	জ	রা	জ	
ষু		তা	রা	ম	গু	ল		ন	দী
ব	ন	জ		খ		চ	ক		পা
	লি			ম	ক	র	ন্দ		ধা
জ	ন	বি	র	ল			র	বা	র

হাতে আসন বিছিয়ে, পাশে বসে গাওয়া ঘিয়ের লুচি, তরকারি, মিষ্টি। ও দিপু, তোর কী হয়েছে রে ? ছটফট করছিস কেন ?"

দিপু পাশ ফিরে শুয়ে কাঁথাটা আবার মাথা পর্যন্ত টেনে নেয়। একটু সময় চুপ করে পড়ে থাকে। তারপর বলে, "মহাদেবদা সেই যে এলে। আর যাওনি ?"

"যাব কী রে ? তোর দাদু ছাড়লে তো ! মাঝে-মাঝে আমাকে আদর করে ডাকতেন 'ভূমানন্দ'। আর আমারও হয়তো বন্ধনদশা ছিল। ইস্কুল ছুটির সময় হয়নি, ঘণ্টা পড়েনি।"

হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে যায় মহাদেবের।

দিপু বলল, "দাদু গান জানতেন ? তোমার গান শুনতেন ?"

কর্তাবাবুর সেই গম্ভীর গলা আজও মহাদেবের কানে বাজে। জমিদারি কাজটাজ শেষ হলে ঠেকে উঠে বসে বলতেন, 'ব্যাটা ভূমানন্দ। গা তো গানটা, আপনারে চিনলে পরে, পরের লাইনটা কী বল তো ভূমানন্দ' ?"

মহাদেব হাসতে-হাসতে বলে, "যায় অচেনারে চেনা।"

"'হ্যাঁ। গা, বেশ গলা ছেড়ে গা।'"

বাবু কালোয়াতি গান গাইতেন। সেই দক্ষিণে কাঁথির দিক থেকে এক ওস্তাদ আসতেন। বাড়ি ছিল ভগবানপুর। পঁচেটগড়ের জমিদারবাড়িতে বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমের এক বড় ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ খেয়াল শিখেছিলেন। নাম ছিল পুলিন অগস্তী। সঙ্গে ওস্তাদ তবলচি রাধাশ্যাম মাইতি। তা তিনি একদিন মহাদেবের গান শুনে কী খুশি ! বললেন, "তোমার গলাটি বড় ভাল মহাদেব। একেবারে তৈরি ধ্রুপদের গলা। তুমি আমার কাছে গান শিখবে ?"

মহাদেব হাত জোড় করে বলেছিল, "ওস্তাদজি, এ জীবনের মতো ওটা আর হল না। তবে সত্যি বড় সাধ ছিল, খেয়াল গান শিখব।"

দিপু বলে, "ও মহাদেবদা, কী ভাবছ ? আচ্ছা, ঠাকুমা গান শুনতেন না ?"

"শুনতেন। কেত্তন। 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।' তারপর 'সখি রে' বলে একটা যা টান দিতাম। সব শুনে-শুনে শেখা। শুধু দরদটা নিজের। বুঝলি ?"

দিপু কিছু বোঝে না। চুপ করে থাকে সে।

সব সময় মহাদেবের মনে হয়, এ দরদটি তো আর কোথাও না, পথের গেরুয়া মাটিতেই ছড়ানো। ঠাকুর, শুধু খুঁজে নিতে হয় গো। শুধু কান পাততে জানতে হয়, পৃথিবীর ধূলিকে পেন্নাম করতে হয়। আহা, মহাপ্রভু হরিনাম করতে-করতে ঝাড়গ্রামের পথে চলেছেন। যে শালবনের ছায়ায় বিশ্রাম করেছেন, যে নদীর জল পান করেছেন, ওরে মহাদেব, সেখানে কান পাত, আজও শুনতে পাবি ...।"

"আরে, দিপুটার কী হল ? ও দিপু, দিপু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে ?"

ঠেলা দিতে গিয়ে মহাদেব বুঝল, দিপুর গায়ে জ্বর। কিন্তু কখন জ্বর এল ? মাথা ধরেছে বলেছিল বটে। হবে না ? কাল সারা দুপুর তো টোটো করে একটা গুলতি নিয়ে জঙ্গলে ঘুরেছে। এত দুষ্টুমি যাবে কোথায় ? এখন কী করা যায় ?

কাঁথাটা সরিয়ে মহাদেব দিপুকে কাঁধে তুলে নেয়। ইস, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

অন্দরমহলে ঢুকে ডাক দেয়, "বউমা, এই নাও। দ্যাখো, দিপুর জ্বর এসেছে। রাত্রে ভাতটাত দিও না।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : দেবাশিস দেব

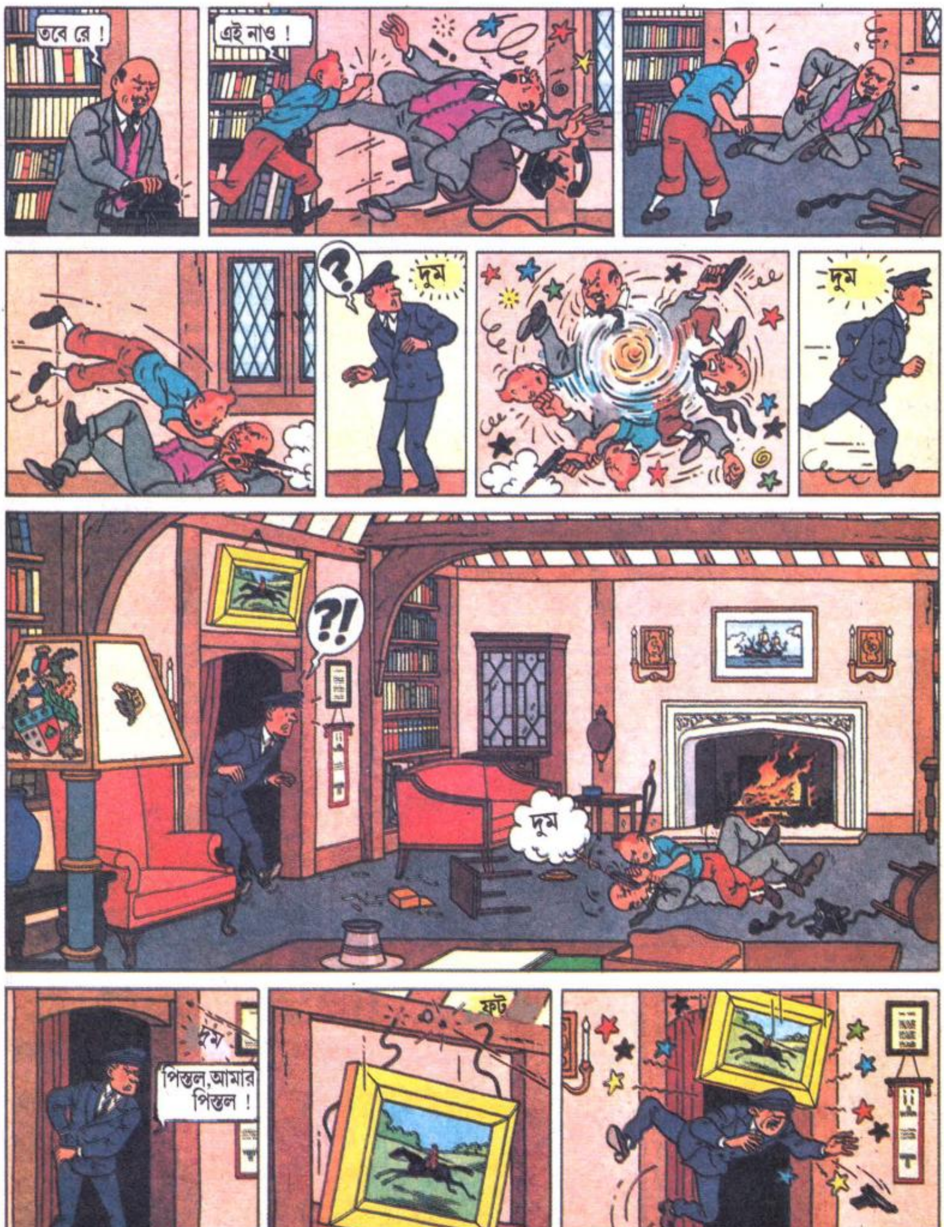
তবে রে !
এই নাও !
?
দুম
দুম
?!
দুম
দুম
পিস্তল,আমার পিস্তল !
ফট

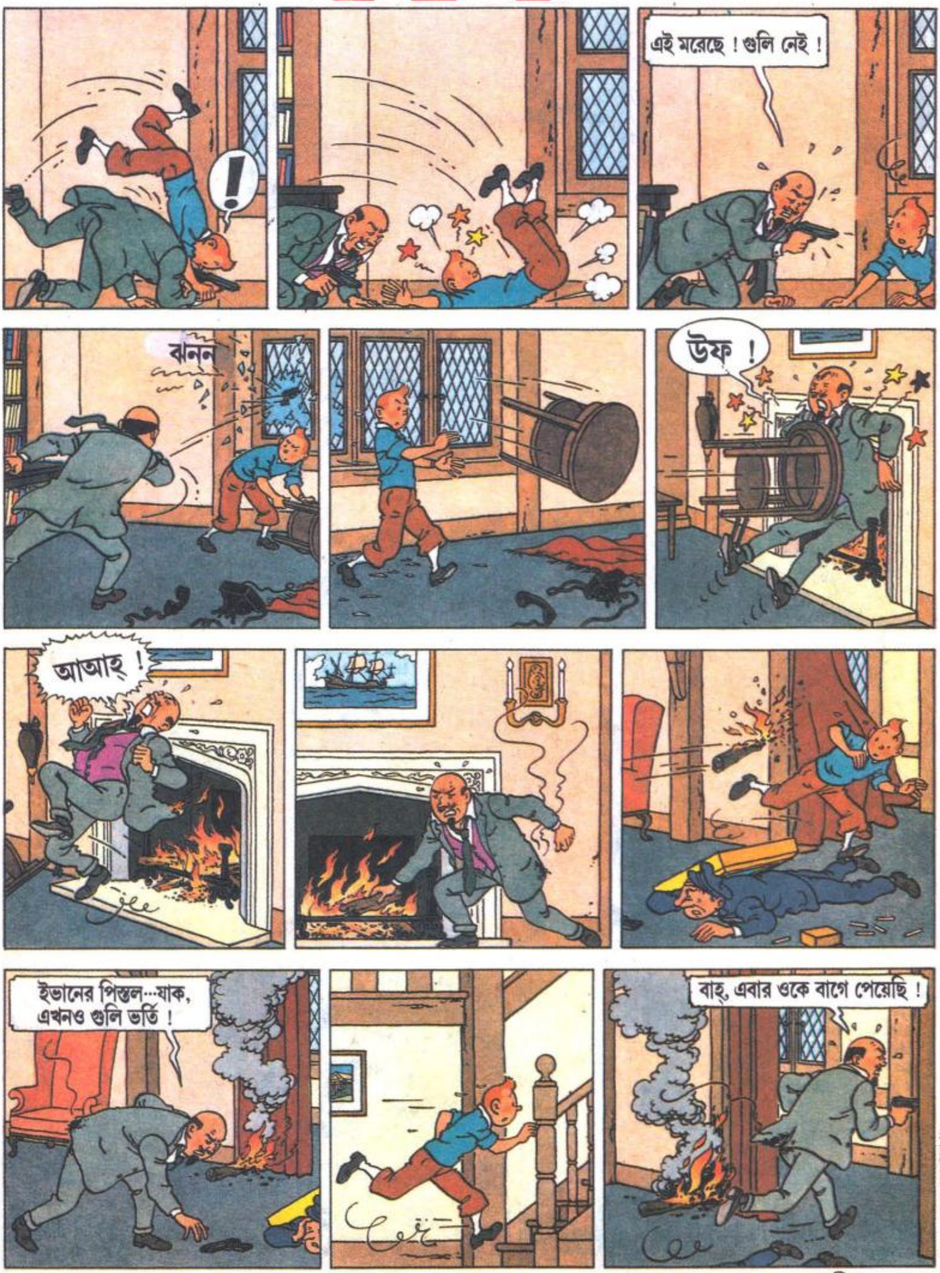

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
আমাদের সারারাতের পরিশ্রম বৃথা··· আমার সব ফসল পুড়ে গেল ! ফসল বিক্রির টাকায় বছর চলবে ভেবেছিলাম !
বাহ্ ! এবারও পেটের দায়ে ছবিগুলি আমাকে বিক্রি করতে বাধ্য হবে !
সার্কাসের এক শিল্পীকে খুন করে তার পোশাকে ব্যাটম্যানদের ধোঁকা দিয়ে, পোশাক বদলে ম্যাক্সওয়েল এসেছে নিজের লাগানো আগুন নেভাতে···
তবে আমি এখনও নিঃস্ব হইনি ! আমার বেসি আছে—সে-ই আমাকে বাঁচাবে, শিগগিরই । সময় প্রায় হয়ে এসেছে···
বেসি ? বেসি কে ?
এই হল বেসি···গাড়ির দৌড়ে এদিকে ওর জুড়ি নেই ! আজ মেলায় গাড়ির দৌড়ে ও বাজি জিতলে আমি দু' হাজার ডলার পেয়ে যাব !
দৌড়ের মাঠে রওনা হওয়ার সময় হল !
ছবির জন্য একটা মানুষ খুন করেছি, আর তুচ্ছ একটা ঘোড়া আমাকে বাধা দেবে !
আমি সঙ্গে যাচ্ছি ! এখন আপনার সঙ্গী দরকার !
চোখ খোলা রাখতে হবে !
ব্রুস আর ডিক ঘরে গিয়ে কাজের পোশাক পরল···
এখন কোথায়··· মেলার সার্কাসে ?
হ্যাঁ । কিন্তু সদর দরজা দিয়ে বেরোলে কব আর ম্যাক্সওয়েলের চোখে পড়ে যেতে পারি । তাই চিলেকোঠা হয়ে পেছন দিক দিয়ে যাব !
দু'জনে যখন চিলেকোঠায় ঢুকল···
আশ্চর্য ! ঘরটা ছবিতে বোঝাই !
এবং অপূর্ব সব ছবি ! এই শৈলী চিনতে আমার ভুল হবে না ! হোমার বেনসন··· সম্ভবত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আধুনিক চিত্রশিল্পী !
অর্থাৎ এখানে অনেক টাকার সম্পদ রয়েছে, আর কব সে-কথা জানেও না ! একটি ছবি বেচলেও ওর সারাজীবন সুখে কাটবে । কিন্তু এগুলি ও পেল কোথায় ?
রবিন, আমাদের আগে জানা দরকার ট্রাপিজ খেলোয়াড় কবের খামারে আগুন লাগাল কেন ?
এক ঘণ্টা পরে···মেলার মাঠের শেষ প্রান্তে···
মেলার মাঠ
উহু··· ও···ও···
স্বীকারোক্তি :
অবশেষে আমি ধরা পড়ে গেলাম । তাই জেলের বদলে আত্মহত্যাই বেছে নিলাম । কারও ঘরে আগুন লাগাতে ভাল না লাগলেও আগুনের নাচ দেখতে আমার ভাল লাগে । শুধু আত্মহত্যা করেই এই বাসনাকে নির্মূল করা সম্ভব । আমি ক্ষমাপ্রার্থী । আমি ছিলাম আগুন লাগাবার বাসনায় বিকারগ্রস্ত এক রোগী ।
অগ্নিবিকারের রোগী ! বেচারা ! বিকার থামাতে আত্মহত্যা করতে হল ।
আত্মহত্যা নয়, রবিন ! এটা হত্যা !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বৃদ্ধের কথা শুনতে-শুনতে অবাক হয়ে গেল সকলে। বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বললেন, "কয়েক বছর আগেও যেটুকু গাছপালা ছিল, এখন আর তাও নেই। আর দু'বছর বাদে আমাদেরই হয়তো দু'গাছা দূর্বা ঘাস কিনতে তোমাদের কলকাতায় ছুটতে হবে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "এই সেদিন আমাদের হাসপাতালের কম্পাউন্ডার প্রাণকেষ্ট পণ্ডিত বললেন, 'খবরের কাগজে নাকি দিয়েছে পাহাড়-জঙ্গল কেটে এখন কলকাতার ফুটপাতে গাছ লাগাবার ধুম পড়ে গেছে।' এটা কি সত্যি?"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর হাসল। বলল, "সত্যি। তা দাদু, এই অরণ্য নিধনে আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হচ্ছে, তাই না?"

"হব না? সেই বেলপাহাড়ির এই পরিণতি কি দেখা যায়? দরকার নেই আধুনিকতার। সেই অরণ্যকে তোমরা আবার ফিরিয়ে দাও। এইসব দেখেশুনে আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এবার মরাই ভাল। এখানকার সব কিছুই এখন বিষিয়ে গেছে। মানুষজন, জলহাওয়া, সব, সব বিষিয়ে গেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এখানে এসে একেবারেই হতাশ হলাম।"

বৃদ্ধ বললেন, "এসেওছ তো ভুল সময়ে। এই ভাদ্রের চড়া রোদে ঘুরবে কী করে? সর্দিগর্মি হয়ে যাবে যে। না হলে তোমাদের বলতাম আরও একটু এগিয়ে যেতে। কয়েক মাইল যদি হাঁটতে পারতে তা হলে আমি তোমাদের এমন একটা জায়গায় পাঠাতাম, যেখানে গেলে মনপ্রাণ ভরে উঠত। পাহাড়ের-পর-পাহাড় আর গভীর জঙ্গল যদি দেখতে চাও, সেইখানে চলে যাও। কিন্তু এই সময়ে সেখানে যাওয়াটা কোনওমতেই উচিত হবে না। একবার বরং শীতকাল দেখে এসো, তখন যেও। এখন তোমরা ঝাড়গ্রামে ফিরে গিয়ে হাটবাজার দেখো, রাজবাড়ি দেখো।"

বিল্টু বলল, "সে তো দেখবই। কিন্তু দাদু, এতদূর এসে রোদ্দুরের ভয়ে ফিরে যাব? একজন আমাদের বলল, এইখানে কোথায় ঠাকরুনপাহাড়ি আছে তাই দেখতে। সেইজন্যই যাচ্ছিলাম আমরা।"

"তাই বলো। কিন্তু ঠাকরুনপাহাড়ি নেহাত কাছেপিঠে নয়। অনেকদূর। আমি তো ওইখানকার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের। তবে তোমরা যদি নেহাতই যাও তা হলে অতদূরে যেতে হবে না। তার আগেই তোমরা পাহাড়-জঙ্গলের দেখা পাবে। কী ভাগ্যিস, ওইদিককার অরণ্য নিধনের কথাটা মনে হয়নি কারও, তাই এখনও অরণ্যের স্বাদ ওখানে গেলে পাবে। তবে আমি যে জঙ্গল

দেখেছি সে-জঙ্গল এখন আর নেই। তবু জঙ্গল ওখানে আছে। পাহাড়ও আছে। সেইসব প্রাচীন মহীরুহ না থাকলেও যা আছে তা নতুন প্রজন্মের।"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর বলল, "আমরা যাব। আপনি আমাদের পথ চিনিয়ে দিন।"

"এই রোদে সত্যিই যাবে তোমরা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের কপালে দেখছি নেহাতই দুর্ভোগ আছে। ওই অঞ্চলের দূর-দূর গ্রামের লোকেদের যাতায়াতের জন্য দু-একটা বাসও আছে। তবে কিনা রাস্তা মেরামতির জন্য সে-বাস এখন দিনকতকের মতো বন্ধ। সাইকেল রিকশও যায়। কিন্তু তারও ওই একই অবস্থা। এখন তোমাদের ওখানে যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। বুঝে দ্যাখো, এবার কী করবে।"

"আমরা যাবই।"

"বেশ, তা হলে যাও। বেলপাহাড়ি দেখতে যারা আসে তারাও জিপ-টিপ নিয়ে বা সাইকেল রিকশয় ওইদিকেই যায়। ওইদিকে বদাডিহি বলে একটা গ্রাম আছে, সেই পর্যন্তই যায় সব। ঠাকরুনপাহাড়িতে খুব কম লোকই যায়।"

"কেন?"

"জানে না বলে। তা ছাড়া বদাডিহিই যখন পাহাড়-জঙ্গলের স্বাদে মন ভরায় তখন কে আর যায় অতদূর। আসলে এখন বেলপাহাড়ি মানে ওকে কেন্দ্র করে ওইসব জায়গা। যাক, কথায়-কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। তোমরা যদি যেতে চাও তা হলে এইবেলা চলে যাও। এই সোজাপথ ধরে খানিক এগোলেই দেখবে একটা মোরাম বিছানো পথ বাঁ দিকে বেঁকেছে। সেই পথ ধরে কোনওদিকে না বেঁকে সোজা এগোলেই পেয়ে যাবে বদাডিহি গ্রাম।"

"কিন্তু ঠাকরুনপাহাড়ি?"

"বদাডিহি থেকে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার বাঁ দিকে বেঁকে বেশ কিছু উঁচু-নিচু জায়গা পার হয়ে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট্ট একটি গাঁও দেহাত। সেইটাই ঠাকরুনপাহাড়ি। তবে দরকার নেই তোমাদের অতদূরে যাওয়ার। তোমরা বদাডিহিই যাও।"

"আপনি তা হলে ঠাকরুনপাহাড়ি যেতে আমাদের মানা করছেন?"

"মানা করছি এই কারণে যে, তোমাদের তা হলে কষ্টের শেষ থাকবে না। এই রোদে বদাডিহি যেতেই দম ছুটে যাবে। আমার তো মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে রক্ত না উঠে যায়। কেননা শুধু গেলেই তো হল না। আবার ফিরেও তো আসতে হবে।"

তিন্নি বলল, "আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। বেশি কষ্ট হলে কাছাকাছি দু-একটা পাহাড় দেখেই ফিরে আসব আমরা। তবে দাদু, আমাদের ফিরতে যদি রাত হয় আমরা কিন্তু আপনার এখানেই এসে উঠব।"

"এ তো খুব ভাল কথা। এই এতবড় দাওয়াটা রয়েছে। মাদুর পেতে দেব। শুয়ে-বসে গড়াবে। আমার ঘরে গুড়-মুড়ির অভাবটা হবে না। খাও না কত খাবে?"

তিন্নি বলল, "এবার আপনাকে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই যে আমরা যাব, পথে কোনও বিপদ-আপদের ভয় নেই তো? মানে দিনকাল এখন যা পড়েছে তাতে···।"

"না না। ভয় কিসের। তবে রাত দুপুরে দু-একটা ছিঁচকে চোর-ডাকাতের ভয় হতে পারে, কিন্তু দিনমানে কোনও ভয়ই নেই।"

বিল্টু বলল, "বেলপাহাড়ির বাসে কে যেন একজন বলছিল ঠাকরুনপাহাড়িতে নাকি যতসব চোর-ডাকাতের আড্ডা।"

"মিথ্যে কথা বলেছে। ওইসব অঞ্চল হচ্ছে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। অযথা ওদের নামে ওইসব কলঙ্ক রটানো ঠিক নয়। তোমরা তো কখনও মেশোনি ওদের সঙ্গে। তাই জানো না। ওদের মতন সহজ-সরল মানুষ হয় না।"

তিন্নি, বিল্টু আর শুভঙ্কর রঙ্গলাল মাইতির কাছ থেকে বিদায় নিল। এখন ওদের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য। যেন-তেন-প্রকারেন মউটাকে খুঁজে উদ্ধার করা। আসল সত্যটা বুড়োর কাছে গোপন করে ছলে-বলে-কৌশলে ওরা অনেক কথাই জেনে নিয়েছে। তবে এটা ঠিক, ওরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে আপাতত এ-পথে ভয়ের কোনও আশঙ্কা নেই।

ওরা বৃদ্ধ রঙ্গলাল মাইতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই নির্দেশিত পথ ধরে রওনা হল। সামান্য কিছুটা পথ যাওয়ার পর একটা চেকপোস্টের কাছে এল ওরা। এখানে কয়েকজন হোমগার্ড ও পুলিশকে বসে থাকতে দেখল। এখন পুলিশ দেখলেই ওদের ভয় করে। কেননা কোনওরকমে একবার যদি ওরা ধরা পড়ে তা হলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের। কাজেই খুব সহজে ধরা পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই ওরা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে হেসে গড়িয়ে এমনভাবে কথা বলতে-বলতে চলল যে, সবাই মনে করল ওরা এখানকারই স্থানীয় ছেলেমেয়ে।

চেকপোস্টের বাঁ দিকে সেই লাল মাটির মোরাম বিছানো রাস্তা। এই পথ যেন ওদের কত পরিচিত। তাই কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করে সেই পথ ধরেই চলল ওরা। এখান থেকে কাছে-দূরে বহুদূরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়ের সারি ওরা দেখতে পেল। এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে মউটা এখন কোথায় কীভাবে আছে তা কে জানে? ওকে উদ্ধার করতেই হবে। সোনার গণপতি তো হাতের মুঠোয়। নাগালের বাইরে শুধু মউ। মউকে ফিরে পেলেই শুরু করবে ওরা দুর্গম পথে দুরূহ পথযাত্রা।

খানিক যাওয়ার পর ওরা দেখল প্রকৃতি যেন এখানে হঠাৎ একটা অন্যরকম চেহারায় রূপ নিতে চাইছে। কী সুন্দর সেই রূপ। লাল মাটির এই দীর্ঘ পথ কতদূর পর্যন্ত গেছে তা কে জানে? যেতে-যেতে এক জায়গায় ওরা দেখল কিছু আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ সেই মাঠফাটা রোদে ঘর্মাক্ত কলেবরে উঁচু বাঁধের মতো রাস্তা মেরামতের কাজে লেগে পড়েছে।

অভিযানের উত্তেজনায় মন উত্তেজিত হলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যও মনকে উদাস করে দেয়। শুভঙ্করও তাই প্রকৃতির এই শ্যামলিমায় বিভোর হয়ে বলল, "যদি আমাদের অভিযান সার্থক হয় তা হলে আবার আমরা একবার শীতকাল দেখে এখানে আসব। বেলপাহাড়িতে ওই রঙ্গলাল বুড়োর আশ্রয়ে থেকে এই জায়গাগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখব। আমার তো মনে হয় এখানে এলে আর কাশ্মির যাওয়ার দরকার হবে না।"

তিন্নি বলল, "সত্যিই জায়গাটা মনোরম। তাই না শুভদা? আমাদের ঘাটশিলাতেও পাহাড় আছে। ধারাগিরিতে ঝরনা, পাহাড় আছে। কিন্তু এর পটভূমি বড়ই চমৎকার। কত তফাত দুটো পরিবেশের মধ্যে।"

ওরা কথা বলতে-বলতেই প্রচণ্ড উদ্যমে পথ চলছিল। কষ্টও হচ্ছিল খুব। রোদ যা চড়েছে তাতে সারা গায়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ওরা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর এক জায়গায় একটি গ্রামে লাল মাটির নিকনো কয়েকটি ঘর দেখতে পেল। খোড়ো চালার সেই

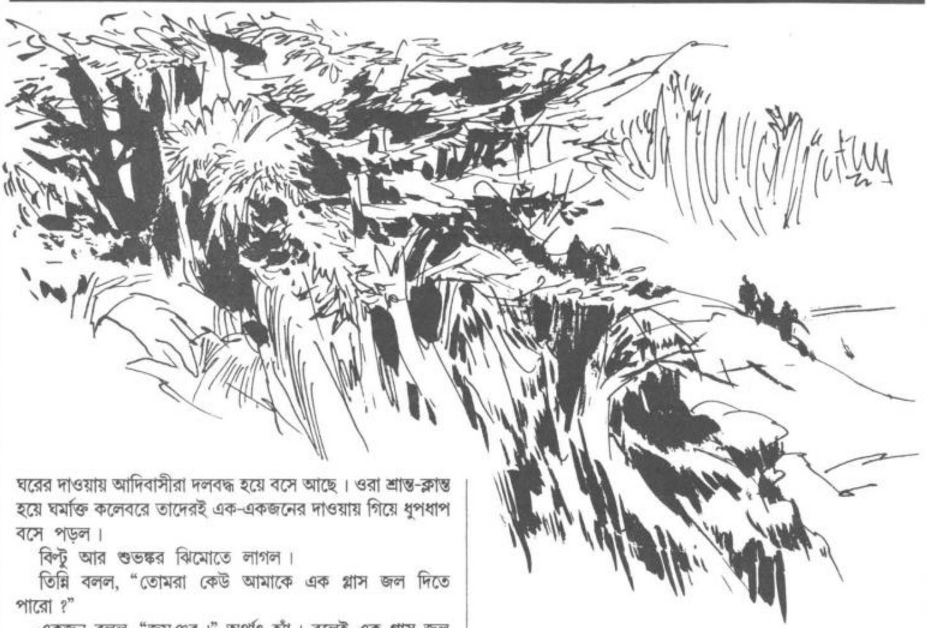

ঘরের দাওয়ায় আদিবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে বসে আছে। ওরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে তাদেরই এক-একজনের দাওয়ায় গিয়ে ধুপধাপ বসে পড়ল।

বিল্টু আর শুভঙ্কর ঝিমোতে লাগল।

তিন্নি বলল, "তোমরা কেউ আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারো?"

একজন বলল, "জমএর।" অর্থাৎ হ্যাঁ। বলেই এক গ্লাস জল এনে দিল।

একটি বউ কাকে যেন বলল, "সেঁড়াঃ ওড়া রিনি গিদড়ে।" অর্থাৎ এরা সব শহরের ছেলেমেয়ে।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন মধ্যবয়সী যুবক এগিয়ে এসে বলল, "এই এত রোদে এদিকে কোথায় যাবে তোমরা?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা ঠাকরুনপাহাড়ি যাব।"

"কে আছে সেখানে?"

"কেউ নেই। এমনই বেড়াতে যাচ্ছি।"

"সে তো অনেক দূর এখান থেকে। তা ধরো না কেন, সাত-আট মাইল তো হবেই। রোদে আলা হয়ে যাবে তোমরা।"

"তা যাব। তবে আমরা শহরে থাকি তো। কখনও পাহাড়-পর্বত দেখিনি। তাই যাচ্ছি একটু পাহাড় দেখতে।"

আদিবাসী রমণীরা বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আহা। শহরের ছেলে। সত্যিই তো, পাহাড় তো দ্যাখেনি। যাও বাছা, যাও। যদি হাঁটতে পারো তো যাও। কী সুন্দর ছেলেমেয়ে গো সব।"

তিন্নি বলল, "ওখানে কোনও চোর-ডাকাতের ভয় নেই?"

"বাব্বা। তা আবার নেই? তবে ওরা যে যা করে সবই বাইরে। এখানে কিছু করে না। এখানে করবেই বা কোথায়? কার কী আছে যে নেবে? তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষ। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।"

আর-একজন বলল, "দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। ওদিকে অনেক গ্রামও আছে। লোকজন আছে। যাও।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের এই গ্রামের নাম কী?"

"জামবনি। ওই ওদিকে হল কাদাপুড়া। অনেক ছোট-ছোট গ্রাম আছে এদিকে। কত নাম বলব?"

ওরা আবার ওদের চলা শুরু করল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দু'পাশের পাহাড়মালা যেন সারিবদ্ধ হয়ে আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। চারদিকে গাছপালা জঙ্গলের রূপ নিতে লাগল। আর তেমনই নির্জনতা ওদের অবাধ বিচরণে আতঙ্কময় হয়ে উঠল। মাঝেমধ্যে দু-একটা আদিবাসী গ্রাম এল আর মিলিয়ে গেল। শুধু বন, পাহাড় আর পাখির ডাক।

এইভাবে অনেকদূর যাওয়ার পর ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানে পাহাড় এবং বনভূমি স্বপ্নময় হয়ে ধরা দিল ওদের চোখে। সে কী রূপ। ঘরের কাছেই যে এইরকম অনাবিল আনন্দ এবং নয়নমনোহর সৌন্দর্য তার ডালি সাজিয়ে রেখেছে তা কে জানত? সেই পাহাড় এবং জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় রাস্তার ধারে বাঁ দিকে খোড়ো চালের ছোট্ট একটি চায়ের দোকান ওদের নজরে পড়ল।

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর সেখানে গিয়ে দোকানের বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল। রোদের তাতে এবং এই দীর্ঘ পথশ্রমে তখন ঘেমে-নেয়ে গেছে ওরা।

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের তিন কাপ চা খাওয়াবে ভাই?"

দোকানদার বলল, "খাওয়াব বইকী। নিশ্চয়ই খাওয়াব। সেইজন্যই তো দোকান খুলে বসে আছি। আমি তো দেখলুম তোমরা এলে, বসলে। আগে একটু বসে জিরোও, ঠাণ্ডা হও, জল খাও, তবে তো। মুড়ি, তেলেভাজা কিছু লাগবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। যা আছে নিয়ে এসো। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে এখন। কখন থেকে হাঁটছি।" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কেরিয়ার গাইড

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং

প্যাকেজিং টেকনোলজি নামের মধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে প্যাকেজিং টেকনোলজিস্টের চাহিদা মেটাতেই এই নতুন কোর্সের প্রবর্তন। কোর্সটির নাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন প্যাকেজিং টেকনোলজি'।

এটি দু' বছরের পাঠক্রম। পাশ করার পর ইনস্টিটিউট থেকে ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে এটিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তখন স্নাতকোত্তর এই কোর্স পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের বি· এসসি, (টেক) প্যাকেজিং হিসেবে গণ্য করা হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্নাতকোত্তর এই পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং কিংবা টেকনোলজির স্নাতক হতে হবে। বিজ্ঞানের স্নাতকদের স্নাতক পর্যায়ে বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স থাকা চাই।

পরীক্ষা

পুরো পাঠক্রমটি চারটি সেমিস্টারে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি সেমিস্টারের মেয়াদ পাঁচ মাস। তিনটি সেমিস্টারের পরীক্ষাতেই সব প্রার্থীকে পাশ করতে হয়। শেষ সেমিস্টারে থাকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এবং প্রোজেক্ট ওয়ার্ক। কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রার্থীকে প্রত্যেকটি পেপারে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং এগ্রিগেটে মোট নম্বরের অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া চাই। ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে প্রার্থীকে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। ৭০ শতাংশের ওপর নম্বর পেয়ে যারা পাশ করবে তাদের ডিস্টিংকশন দেওয়া হয়।

প্যাকেজিং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও কুশলতার জন্য ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে দেশে কৃষি, শিল্প, ভোগ্যপণ্য সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন দারুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে এইসব উৎপাদিত সামগ্রী দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরকার বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলো মোড়কজাত করা কিংবা পাত্রে ভরে পাঠানো। এ-কথা মনে রেখেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং স্নাতকোত্তর কোর্স প্রচলন করেছেন।

(১) এটি দু' বছরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম।

(২) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ার পর এই কোর্সে সফল ছাত্রছাত্রীদের 'বি· এসসি, (টেক) প্যাকেজিং' ডিগ্রি দেওয়া হবে।

(৩) পাঠক্রমটির মধ্যে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ আছে।

(৪) প্যাকেজিং প্রযুক্তিবিদ্যার সমস্ত দিক নিয়ে পঠন-পাঠনের সুযোগ আছে।

(৫) এই নতুন কোর্স পাশ করার পর চাকরির ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পড়াশোনার খরচ

প্রতি সেমিস্টারের জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দিতে হয় টিউশন ফি হিসেবে ১০০০ টাকা সেমিস্টার পিছু হস্টেলের ঘরভাড়া ৫০০ টাকা। এ ছাড়া কশান মানি ডিপোজিট দিতে হয় ৫০০ টাকা এবং মেস ডিপোজিট ৫০০ টাকা। ছুটিতে হস্টেলে থাকলে অতিরিক্ত ১০০ টাকা দিতে হয়। সেমিস্টার শুরুর আগেই সেই সেমিস্টারের জন্য টাকা জমা দিতে হয়।

আর্থিক সহায়তা

২৫ শতাংশ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। প্রার্থী পিছু এই মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ২৫০ টাকা। উপরন্তু মাসিক বৃত্তি প্রাপকদের টিউশন ফি দিতে হয় না। ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল এবং পরবর্তীকালে সেমিস্টার পরীক্ষার ফল বিচার করে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়।

ভর্তির নিয়মকানুন

প্যাকেজিং টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়। দু' ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয়, লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ। প্রতি বছর মে-জুন

মাসে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়। জুলাই মাস নাগাদ ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা নিয়ে থাকে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য কার্যালয়। নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে মার্কশিট ও অন্যান্য সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হয়। কুড়ি টাকার পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যালয়

থেকে আবেদনপত্র এবং তথ্যপুস্তিকা সংগ্রহ করা যায়। ব্যাঙ্ক ড্রাফট কিংবা পোস্টাল অর্ডার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং-এর অনুকূলে কাটতে হবে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

অন্যান্য সুযোগ

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি অত্যাধুনিক এবং উচ্চ মানের। সারা পৃথিবীতে যত সাজানো-গোছানো উন্নত মানের ল্যাবরেটরি আছে এটি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে এই ল্যাবরেটরিতে।
শুধু ল্যাবরেটরিই বা কেন, ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিও খুব সমৃদ্ধ। ৪ হাজারের ওপর প্রয়োজনীয় সব বই আছে এখানে। তা ছাড়া আছে আরও নানা সহায়ক বই এবং পত্রপত্রিকা। স্নাতকোত্তর এই পাঠক্রমটি আবাসিক পাঠক্রম নয়। তবুও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধের জন্য হস্টেলের সুযোগ আছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং

অনুমোদিত শিল্প সংস্থায় প্রশিক্ষণের পর সব ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার জন্য (ইভ্যালুয়েশন) প্রতিষ্ঠানে রিপোর্ট জমা দিতে হয়। সফল ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শংসাপত্রও দেওয়া হয়। পাঠক্রমের মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংয়ের গুরুত্ব খুব বেশি, কেননা এখানে হাতে-কলমে কাজ শেখার এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে শেখার সুযোগ থাকে। এজন্য এই ট্রেনিংয়ের ওপর পরীক্ষায় ৩০০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। ৫০ নম্বর থাকে নিয়মিত উপস্থিতি, ভাল ব্যবহার এবং ট্রেনিংয়ে সফলতার জন্য; ১২৫ নম্বর থাকে ট্রেনিং-সংক্রান্ত বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য এবং ১২৫ নম্বর নির্দিষ্ট থাকে ট্রেনিংয়ের ওপর জমা দেওয়া রিপোর্টের ওপর।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা

নানা বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগ কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেবেন, সেটি তাঁরাই ঠিক করে থাকেন। সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের কাজ সম্বন্ধে পরিকল্পনা নিতে হয় এবং তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফল বের করতে হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য আলাদা- আলাদা নম্বর আছে

পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা

পাঠক্রমটি এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যাতে প্যাকেজিং প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হতে পারেন। ফলে প্যাকেজিং উৎপাদিত শিল্পসংস্থায় কিংবা যেসব শিল্পসংস্থায় প্যাকেজিং-এর ব্যবহার খুবই জরুরি সেসব জায়গায় কর্মসংস্থান হতে পারে সহজেই। প্যাকেজিং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ কারিগরি কুশলতা বিষয়ে যেমন ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়, তেমনই বাস্তবক্ষেত্রে শিল্পসংস্থায় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করতে হয় সে-বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এজন্য পাঠক্রমের ৬০ শতাংশ জুড়ে থাকে থিওরি সেশান এবং বাকি ৪০ শতাংশই প্র্যাকটিক্যাল সেশান। থিওরি অংশে শ্রেণীকক্ষের পাঠের

সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরি রেফারেন্স ওয়ার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর হাতে-কলমে কাজ শেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—ল্যাবরেটরি এক্সারসাইজ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, প্রোজেক্ট ওয়ার্ক এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং।

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র

ইনস্টিটিউটের মুখ্য কার্যালয় বম্বে শহরে। প্লট ই ২, এম আই ডি সি এরিয়া, চাকালা, আন্ধেরি (ইস্ট), বম্বে-৪০০০৯৩।
আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে মাদ্রাজ, নয়া দিল্লি এবং কলকাতায়। মাদ্রাজ কেন্দ্রের ঠিকানা : ১ বি, ফার্স্ট মেন রোড, গান্ধীনগর, অ্যাডিয়ার, মাদ্রাজ-৬০০০২০। নয়া দিল্লি অফিসের ঠিকানা : বি ২৮-২৯, ফ্ল্যাটেড ফ্যাক্টরিজ কমপ্লেক্স, ঝাণ্ডেলওয়ালান, রানি ঝাঁসি রোড, নয়া দিল্লি-১১০০৫৫।
পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা : ব্লক সি পি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

পাঠ্যসূচি

পুরো পাঠ্যসূচিকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধের জন্য তিনটি স্কিমে ভাগ করা হয়। এজন্য প্রত্যেক সেমিস্টার শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।
স্কিম – ১-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচির মধ্যে আছে, ইকনমিক্স, ম্যাথমেটিক্স-১, কেমিষ্ট্রি এবং ফিজিক্স, ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-১, মেকানিক্যাল টেকনোলজি, এঞ্জিনিয়ারিং মেকানিজমস, প্যাকেজিং টেকনোলজি-১, প্যাকেজিং টেকনোলজি-২। প্যাকেজিং টেকনোলজি-১-এর বিষয়সূচিতে সাধারণত থাকে ইনট্রোডাকশন টু প্যাকেজিং এবং প্যাকেজিং টেকনোলজি-২-তে থাকে সেলুলোজ টেকনোলজি। এ ছাড়া সব বিষয়েই প্র্যাকটিক্যাল করতে হয়।
স্কিম— ২-এর বিষয়সূচিতে আছে ম্যাথমেটিক্স-২, অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স-২, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স, ফ্লুয়েড মেকানিক্স অ্যাণ্ড মেশিনারি, প্যাকেজিং টেকনোলজি-৩ (ফাইবার বোর্ড অ্যাণ্ড গ্লাস টেকনোলজি), প্যাকেজিং টেকনোলজি-৪ (প্লাস্টিক টেকনোলজি), প্যাকেজিং টেকনোলজি-৫ (প্যাকেজিং প্রিন্টিং টেকনোলজি) ইত্যাদি। এসব থিওরিটিক্যাল বিষয়ের ওপরও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস রয়েছে।
স্কিম— ৩ সিলেবাসের বিষয়সূচিতে আছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-১ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-২, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট-৩, মার্কেটিং, মার্কেটিং রিসার্চ, মেটিরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট, প্যাকেজিং টেকনোলজি-৬ মেটাল (কনটেনারস), প্যাকেজিং টেকনোলজি-৭, প্যাকেজিং টেকনোলজি-৮ (ফুড, ফার্মাসিউটিক্যালস, কসমেটিক্স অ্যাণ্ড কেমিক্যালস), প্যাকেজিং টেকনোলজি-৯ (মেশিনারি)। সর্বোপরি বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

বইয়ের খবর

রূপকথার স্বাদ

টম থাম্ব-এর গল্প তো আমরা সকলেই পড়েছি। সেই যে বুড়ো আঙুলের সমান লম্বা ছেলেটির কাহিনী। প্রায় তেমনই এক খুদে মেয়ের কার্যকলাপ নিয়ে জেন লুইস কারি লিখেছেন তাঁর নতুন বই 'লিটল লিটল সিস্টার'।
এক ছোট্ট গ্রামে থাকে এক কৃষক আর তার বউ। কিন্তু, তাদের মনে বড় দুঃখ—তাদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। একদিন কয়েকটা আপেল কিনে এনেছে তারা, সেগুলো কাটবার সময় হঠাৎ তাদের কুকুরটা বলল, "হলদে আপেলটা কেটো না, ওটা জাদু-আপেল।" সেই আপেল ফেটে রাত্তিরবেলা বেরিয়ে এল ফুটফুটে এক মেয়ে। যদিও তার আকার 'ইঁদুরছানার চেয়ে খুব বড় নয়'। সেই ছোট্ট মেয়ের সঙ্গী হল সাদা বেড়াল আর বাদামি কুকুর। তিনজনে মিলে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীটা চিনতে লাগল। শেষে কীভাবে তারা ছ'টা ভেড়াকে বন্যায় ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচাল, সেটা গল্পের প্রধান আকর্ষণ।
এরিক ব্লেগভাডের আঁকা ছবিগুলিও অসামান্য। রঙে রেখায় মনোমুগ্ধকর। পুরো বইটিতে ছড়িয়ে আছে রূপকথার স্বাদ। প্রকাশক : কলিন্‌স সংস্থা। দাম ৯·৯৫ পাউণ্ড।

এরলের দুর্দান্ত জয়

এরল কোনও মানুষের নাম নয়। সে এক ইঁদুরছানা। খুব ছোট নয়, তাকে কিশোর বলা চলে।
ড্রেনপাইপের মধ্যে তাদের স্কুল। সেই স্কুলে ওপরের দিকের ক্লাসে পড়ে এরল। পড়াশোনায় এরল বরাবরই কাঁচা। কিন্তু অন্যদিকে সে স্কুলের গর্ব। খেলাধুলোয় সে চৌখস। স্পোর্টসের দিন একগাদা প্রাইজ তার বাঁধা। কেমন করে সে যোগ দিল আন্তঃস্কুল 'র‍্যাটাথেলন'-এ, আর সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে জিতে আনল সবসেরা পুরস্কার, এরলের সেই দুর্দান্ত জয়ের কাহিনী নিয়ে লেখা 'থ্রি চিয়ার্স ফর এরল' পড়ে খুব ভাল লাগে। বইটির লেখক ব্যাবেট কোল। লেখকের অতুলনীয় কল্পনাশক্তি, হাস্যপরিহাসভরা তরতাজা ভাষা আর অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি বইটিতে আলাদা স্বাদ এনেছে। হাইনম্যান প্রকাশন সংস্থার উদ্যোগে বইটি বেরিয়েছে। দাম : ৫·৯৫ পাউণ্ড।

নানারকম বই

মামণিকে বাবা
জওহরলাল নেহরু
ভাষান্তর : হেনা চৌধুরী
কথা ও কাহিনী
কলকাতা-৭৩, দাম : ২০ টাকা

ইন্দিরার বয়স তখন দশ। বাবার কাছ থেকে দূরে মুসৌরিতে থাকতেন তিনি। তাঁর বাবা

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সে সময় তাঁর আদরের মেয়ে 'ইন্দু'কে চিঠি লিখতেন। ইংরেজিতে লেখা সেইসব চিঠি ছিল ইন্দিরার কাছে অমূল্য সম্পদ। সেই চিঠিগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন হেনা চৌধুরী। বইটি ছোটদের সংগ্রহে রাখার মতো।

পরেশ সরকার

ভাটি থেকে উজানে
সুখেন্দু ভট্টাচার্য
অমৃতধারা কলকাতা-৯
দাম : ১০ টাকা

মা বাবা হারা ছোট্ট নৌকোর মাঝি কাজু এবং তার জগৎকে নিয়ে লেখা এই বই 'ভাটি থেকে উজানে'। গঙ্গাসাগর মেলা, নৌকোডুবি, নদী, মাটি, প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা দারুণ কৌতূহলকর কিশোর উপন্যাস, পড়তে পড়তে একাত্ম হয়ে যেতে হয়।

অঞ্জন সিকদার

বিস্ময়কর জীবজগৎ (প্রথম খণ্ড)
বিকাশকান্তি সাহা
ডেল্টা ফার্মা
কলকাতা, দাম : ১৬ টাকা

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সারা পৃথিবীতে দশ লাখেরও বেশি প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে পোকামাকড়ই আছে প্রায় আট লক্ষ। মাছ আছে তিরিশ হাজার, উভচর প্রাণী তিন হাজার, সরীসৃপ ছ' হাজার, পাখি ন' হাজার, আর স্তন্যপায়ী তিন হাজার প্রজাতির। 'বিস্ময়কর জীবজগৎ' বইটিতে উনসত্তরটি প্রাণীর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন নিয়ে

দাদু-দিদিমার বাড়ি থেকে গাড়িতে চেপে ফিরতে-ফিরতে একটি ছোট মেয়ে দেখল, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে আকাশের চাঁদ। আবার বাড়ি ফিরে দ্যাখে, তার জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে গোল চাঁদ। তারপর একসময় মেয়েটির মনে হল চাঁদ যেন তার মনের মধ্যেও বসে থাকে সব সময়। আবার একদিন তার মনে হল, চাঁদ যেন তার বাবা-মা আর দিদিমার মতো সর্বদা তার ওপর স্নেহনজর রেখে চলেছে। শেষে একদিন স্বপ্নে দেখল মেয়েটি, চাঁদ তাকে বলছে যে, বহুযুগ ধরে এমনই করে সে ছোটদের সকলের সঙ্গেই মিশে আছে, জ্যোৎস্না হয়ে আসছে কাছে, শুধু তাদের কারও তাকে একান্ত নিজের করে রেখে দেওয়ার জো নেই।
ভিন্ন স্বাদের এই কাহিনীটির সবচেয়ে বড় অভিনবত্ব এই যে, পুরো বইটি কবিতায় লেখা। সহজ, অনাড়ম্বর ভাষায় সুন্দরভাবে বইটি লেখা হয়েছে। বইটির নাম 'দি মুন কামস হোম'। লেখক : মেরি জো সলটার। প্রকাশক : আলফ্রেড নফ সংস্থা। দাম : ১১·৯৫ ডলার।

ভালুকছানা আর রবিন পাখি

এক ছিল ভালুকছানা। সে বড় দুষ্টু আর ছটফটে। সারাদিন নানারকম দস্যিপনা করে বেড়ায়। তার সেইসব কাণ্ডকারখানা সবসময় খুব নিরাপদ নয়। বিপদ ঘটবার আশঙ্কা পদে-পদে। আর, তেমন বিপদ ঘটে প্রায়শই। তখন ভালুকছানাকে সারাক্ষণ বুদ্ধির জোরে বাঁচিয়ে দেয় তার বন্ধু ছোট্ট রবিন পাখি। ভালুকছানা আর রবিন পাখির নানা ঘটনাকে একসূত্রে গেঁথে সুন্দর ভাষায় গল্প হিসেবে উপস্থিত করেছেন লেখিকা জুলিয়া ম্যাকরাই। বইটির নাম 'হোল্ডটাইট, বিয়ার'! হাবিনসন প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত। দাম : ৬·৯৫ পাউন্ড। বইটির ছবিগুলিও চিত্তাকর্ষক।

অভীক মজুমদার

নানারকম

ধাঁধা

"এবারের ধাঁধাগুলো একটাও আমার নিজের নয় সতুবাবু।" ধাঁধার খাতা খুলে একটা খাম বার করল ছোট্কা। খামের উপরে ছোট্কার নাম ও ঠিকানা লেখা। তবে হাতের লেখাটা অচেনা। হাতের লেখাটা বেশ পরিচ্ছন্ন। কার চিঠি হতে পারে, ভেবে কূল পেলেম না।
"এই চিঠিটা পাঠিয়েছে শ্রীমান পিনাকী দাশগুপ্ত। সোদপুর থেকে।" ছোট্কা খাম থেকে একটা চিঠি বার করে তার উপর চোখ রেখে বলল, "এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছে ছেলেটি। ধাঁধা ভালবাসে, তার উপর পরীক্ষার পরে টানা তিন মাস ছুটি। এই ছুটিতে কী করবে, তাই অনেক অনেক কাজ নিজেই

খুঁজে নিয়েছে। তারই কিঞ্চিৎ নমুনা এই ধাঁধাগুলো।" ছোট্কা এবার আমার দিকে তাকাল। বলল, "কই, লিখে নাও সতুবাবু।" আমি লিখে নিলাম। তো, সেইগুলোই এবার শোনাই তোমাদের।
প্রথম ধাঁধা ॥ বিভিন্ন বয়সী তিন বন্ধু। তপন, রাজীব এবং জয়ন্ত। তপন যাঁর নাম, তিনি বিয়ে-থা করেননি।
এই তিনজনের মধ্যে যিনি বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ, তাঁর রোজগার যা, তার থেকেও কম রোজগার করেন রাজীব। এঁদের মধ্যে যাঁর বয়স সব থেকে বেশি, তাঁর রোজগারই সব থেকে বেশি। অবশ্য, তাঁর উপার্জনের একটা বড় অংশই খরচ হয়ে যায় স্ত্রীর অসুখে আর মেয়ের পড়াশুনোয়। মেয়েটি মেধাবী। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।
এই তিন অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কার বয়স সব থেকে বেশি আর সর্বকনিষ্ঠ কোনজন, বলতে হবে।
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন মাস ক্যালেণ্ডারে থাকে না?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

সতিমাপাকনু

গতবারের উত্তর ॥ (১) ভদ্রলোক যে-কোনও

একজনের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নটা করবেন: "তোমার ভাইকে যদি শহরে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে বলা হয়, সে কোন রাস্তাটা দেখাবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে যে-রাস্তাটা দেখাবে উত্তরদাতা—সে মিথ্যেবাদীই হোক কি সত্যবাদী—তার উলটো রাস্তাটাই হবে শহরের রাস্তা। কেন? ধরা যাক মিথ্যেবাদী ভাই জবাব দিল। সে তো জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তাটাই দেখাবে। কেননা, সত্যবাদী ভাই ঠিক রাস্তা দেখাবে সে জানে। আবার সত্যবাদী ভাই যদি জবাব দেয় ভদ্রলোকের প্রশ্নের, সেও দেখাবে জঙ্গলের রাস্তা। কেননা, সে তো জানাচ্ছে মিথ্যেবাদী ভাইয়ের কী জবাব হবে, সেটা। অর্থাৎ,ওই একটি প্রশ্নের উত্তরে দু' ক্ষেত্রেই দেখানো হবে জঙ্গলের রাস্তা। তার উলটো পথটাই গেছে শহরের দিকে। (২) অমনিবাস। যেমন শরদিন্দু অমনিবাস। (৩) শিকারকাহিনী।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

যদি বলি, এমনভাবে দু'জন লোককে দাঁড় করিয়ে দিতে পারো যে কাছে থেকেও তারা একজন আর-একজনকে দেখতে পারবে না, তা হলে? নিশ্চয়ই জানো যে, এর সমাধান খুবই সহজ। পিঠে-পিঠ ঠেকানো অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিলেই হল। একজন অন্যজনকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না। তবে অনুভব করতে পারবে একে অন্যের উপস্থিতি।
কিন্তু এর বদলে যদি তোমাকে বলি, এমনভাবে দু'জন লোককে দাঁড় করিয়ে দিতে পারো যে, তাদের মধ্যে বড় জোর এক ইঞ্চি ব্যবধান থাকবে, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, এমনকী চেষ্টা করলেও ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না? ঠিক ধরেছ। এই প্রশ্নটা আমি তোমাদের করছি। তোমরা আবার সময়-সুযোগমতো করো বন্ধুদের। এটাই এবারের মজার খেলা।
তবে মজা তো শুধু প্রশ্ন করেই শেষ হবার নয়। বন্ধুরা যদি চ্যালেঞ্জ করে তোমাকে? বলে, এ আবার হয় নাকি? এ উদ্ভট প্রশ্ন। অবাস্তব ব্যাপার। তখন? তখন কি মজাটা মাঠে মারা যাবে?
না। তা মোটেও যাবে না। তুমি ঠিকই দেখিয়ে দিতে পারবে, যা বলেছ, তা উদ্ভট নয়, অবাস্তব নয়, অসম্ভব নয়। তবে, তোমাকে হাতেনাতে প্রমাণ করে দিতে হবে।
কীভাবে করবে? বেশ। শিখিয়ে দিই বরং।
দু'জন বন্ধুকে বেছে নাও। সেইরকম দু'জন বন্ধু, যারা খুব অহঙ্কারী। যাদের

ভাবখানা এইরকম যে, আমি যা পারি, আর কেউ পারে না। আমি যা জানি, আর কেউ জানে না। এমন বন্ধু দু'জনকে বেছে নাও। তাতে মজাটা বেশি হবে।
এবার তাদের দু'জনকে একটা ঘরের দু' দিকে রেখে, অর্থাৎ দরজার বাইরে একজনকে, অন্যজনকে ঘরে ঢুকিয়ে, ছিটকিনি তুলে দাও। এবার দু'জনকেই বলো, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে। এবার বলো, তোমাদের মধ্যে এক ইঞ্চির তফাত, অথচ দ্যাখো, কেউ-কাউকে ছুঁতে পারছ না, দেখতে পারছ না।
দেখবে, কী হাসির হুল্লোড় ওঠে বাকি বন্ধুদের মধ্যে।

মজারু

কত কথা

সেদিন একজনকে বলতে শোনা গেল, কলকাতার মেট্রো রেলের এক-একটা স্টেশন যেন পাতালনগরী। তোমরা সেটা মানো চাই

না-মানো, একটা কাজ করো তো! এই 'পাতাল-নগরী' কথাটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী কী শব্দ পাওয়া যায় দ্যাখো।
২। এবারে চার অক্ষরের তিনটি শব্দ দিচ্ছি। এই শব্দগুলোর অক্ষর উলটে-পালটে অন্য তিনটি শব্দ তৈরি করতে হবে।

(ক) দময়ন্তী। (খ) বৎসর। (গ) দেবগুরু।
৩। 'জবর' শব্দটির অক্ষর উলটে-পালটে অন্য দুটি শব্দ তৈরি করো তো।

উত্তর: ১। পা, পাতা, তাল, পাতাল নগ— মোট পাঁচটি শব্দ।
২। (ক) মদয়ন্তী (বেলফুল)। (খ) সরবৎ (শরবত-এর বিকল্প বানান)। (গ) গুরুদেব।
৩। বরজ, রজব (ইসলামি মাস)।

কথক

• শান্তিপুরী • ধনেখালি • বেগমপুরী
• সিল্ক টাঙ্গাইল • জামদানী • বালুচরী
• পলিকট শাড়ি • পলিয়েস্টার স্যুটিং-শার্টিং
• ড্রেস মেটিরিয়াল এবং রেডিমেড
তন্তুশ্রী
বাংলার তাঁত – বাংলার শাড়ি
Samriddhi

ANANDAMELA 5 SEPTEMBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

চোখ এর আমার মত...
নাক এর আমার মত... হাসি এর আমার মত
কিন্তু ত্বক আমার এর মত

এইটাই সন্তুর সাবানের বিস্ময়! সন্তুর, হলুদ আর চন্দনের গুণে আমার ত্বক বহু বছর পর্যন্ত তরুণী সুলভ উজ্জ্বল ও ফুলের মত কোমল রাখে। তাইতো সবাই বলে, আমরা দুজন একদম একই রকম দেখতে।

সন্তুর
হলুদ-চন্দনযুক্ত সাবান

জীবনে আনে লাবণ্য

WIPRO LIMITED Closer to the consumer.

ULKA-13371 BEN